গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ বরিশাল

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
আফসানা ইয়াসমীন

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
বরিশাল

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪ এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস

জেলা তথ্য : বরিশাল

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং আফসানা ইয়াসমীন যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ ও ড. মোঃ লিয়াকত আলী। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া বরিশাল জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় আছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে বরিশাল জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা, ভৌত ও মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এ বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর ও বাংলাপিডিয়া থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে বরিশালের উপর লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১। আহমেদ, গিয়াসউদ্দীন, ২০০৩। বরিশাল বিভাগের ইতিহাস। বরিশাল-ঢাকা, জুলাই ২০০৩।

২। বি.বি.এস., ১৯৯৯। কৃষি শুমারি ১৯৯৬ : জেলা সিরিজ বরিশাল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, জুলাই ১৯৯৯।

৩। হোসেন, আবুল, ১৯৯৯। ভোলা জেলার ইতিহাস। ভোলা, ১৯৯৯।

৪। PDO-ICZMP, 2001. Inventory of Coastal & Estuarine Island & Char Lands (Draft Report), Program Development Office for Intergrated Coastal Zone Management Plan Project; Bangladesh. Dhaka, August 2001.

৫। CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh : Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services. Dhaka, May 2004.

৬। Rashid, M., H., 1980. Bangladesh District Gazetteers Bakerganj. Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, December 1980.

এ ছাড়াও বইটির বিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- জনাব মালিক শামীম আখতার, জেলা সমন্বয়কারী, ঢাকা আহ্সানিয়া মিশন, বরিশাল।
- জনাবা রহিমা সুলতানা কাজল, পরিচালক, আভাস, বরিশাল।
- জনাবা জাহানারা বেগম স্বপ্না, নির্বাহী পরিচালক, চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, বরিশাল।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা **১-৫**
এক নজরে বরিশাল ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারণী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ **৭-১৮**
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭
কৃষি সম্পদ ১১
দুর্যোগ ১৪
বিপদাপন্নতা ১৮

জীবন ও জীবিকা **১৯-২৩**
জনসংখ্যা ১৯
জনস্বাস্থ্য ২০
শিক্ষা ২১
অভিবাসন ২১
সামাজিক উন্নয়ন ২১
প্রধান জীবিকা দল ২২
অর্থনৈতিক অবস্থা ২৩
দারিদ্র্য ২৩

নারীদের অবস্থান **২৫-২৬**

অবকাঠামো **২৭-৩১**
রাস্তা-ঘাট ২৭
নৌ-পথ ২৭
পোল্ডার ২৮
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ২৮
হাট-বাজার ও বন্দর ২৮
বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ২৯
শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো ২৯
সেচ ও গুদাম সুবিধা ৩০
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ৩০
গবেষণা প্রতিষ্ঠান ৩১
উন্নয়ন প্রকল্প ৩১
হোটেল বা অবকাশ যাপন কেন্দ্র ৩১

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা **৩৩-৩৭**
কৃষি সমস্যা ৩৩
পরিবেশগত সমস্যা ৩৫
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ৩৬
যোগাযোগ সমস্যা ৩৭
পর্যটন বিষয়ক সমস্যা ৩৭

সম্ভাবনা ও সুযোগ **৩৯-৪১**
কৃষি ও অর্থনীতি ৩৯
প্রাকৃতিক সম্পদ ৪০
আর্থ-সামাজিক ৪০
শিল্প ও বাণিজ্য ৪১
পর্যটন শিল্প ৪১
যোগাযোগ ব্যাবস্থা ৪১

ভবিষ্যতের রূপরেখা **৪৩**

দর্শনীয় স্থান **৪৫-৪৭**

জেলা মানচিত্র

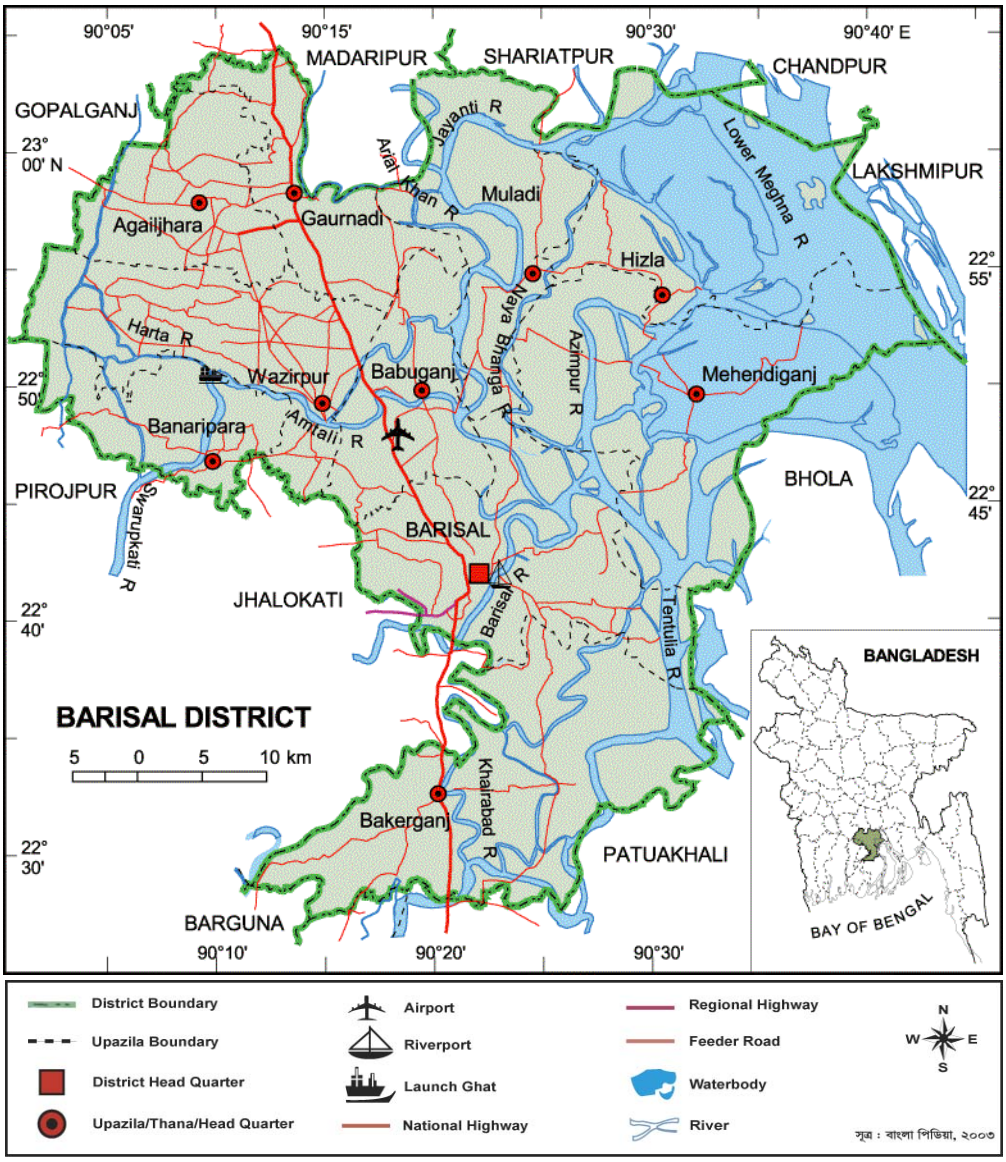

BARISAL DISTRICT
MADARIPUR
SHARIATPUR
CHANDPUR
GOPALGANJ
LAKSHMIPUR
PIROJPUR
BHOLA
JHALOKATI
PATUAKHALI
BARGUNA
Agailjhara
Gaurnadi
Muladi
Hizla
Mehendiganj
Wazirpur
Babuganj
Banaripara
BARISAL
Bakerganj
Jayanti R
Arial Khan R
Lower Meghna R
Harta R
Naya Bhanga R
Azimpur R
Amtali R
Swarupkati R
Barisal R
Tentulia R
Khairabad R
90°05'
90°15'
90°30'
90°40' E
90°10'
90°20'
90°30'
23° 00' N
22° 55'
22° 50'
22° 45'
22° 40'
22° 30'
5 0 5 10 km
BANGLADESH
BAY OF BENGAL
District Boundary
Upazila Boundary
District Head Quarter
Upazila/Thana/Head Quarter
Airport
Riverport
Launch Ghat
National Highway
Regional Highway
Feeder Road
Waterbody
River
N
W
E
S
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে বরিশাল জেলা অবস্থিত। বরিশালের উত্তরে শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও চাঁদপুর, পূর্বে লক্ষ্মীপুর ও ভোলা, পশ্চিমে ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জ এবং দক্ষিণে পটুয়াখালী ও ঝালকাঠি জেলা। পদ্মা-মেঘনার শাখা প্রশাখা বিধৌত এ বরিশাল জেলা। ১৯৯৩ সালে পহেলা জানুয়ারি বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালী জেলার সমন্বয়ে বরিশাল বিভাগ গঠিত হয়। এটি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এবং মেঘনা নদী, নদী বন্দর, কৃষি উন্নয়ন ও নগর সংস্কৃতির কারণে বরিশাল জেলা এ বিভাগের কেন্দ্রবিন্দু। জেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য নগরায়ণ। একযোগে সড়ক, নৌ ও আকাশপথ, বিদ্যুৎ, অবকাঠামো, পয়ঃ ও পানি সুবিধাসহ শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ বরিশালের নগরায়ণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। বর্তমানে বরিশাল শহর দেশের ছয়টি সিটি করপোরেশনের মধ্যে একটি ।

এই গুরুত্বপূর্ণ জনপদটির পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন বা বিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। বরিশালের আদি নাম চন্দ্রদ্বীপ। চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল বাকলা। চতুর্দশ শতকে রাজা দনুজমর্দন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য, সুগন্ধা নদীর তীরে প্রাচীন বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। মোঘল আমলে সুবে বাংলার একটি সমৃদ্ধশালী সরকার হিসেবে বাকলার পরিচিতি ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রবাদ পুরুষ আগা বাকের এর নামানুসারে তৎকালীন বাকলা চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ করা হয় বাকেরগঞ্জ। আগা বাকের সেই সময়ে বাকেরগঞ্জ জেলার বুজুর্গ উমেদপুর ও সেলিমাবাদ পরগনার একজন প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন এবং নবাব আলী বর্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬) -র শাসনামলে চট্টগ্রামের ফৌজদার ছিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম বুজুর্গ উমেদপুরে জমিদারীর গোড়াপত্তন করেন বলে এ এলাকার নাম হয়ে যায় বাকেরগঞ্জ। পরবর্তীতে ১৭৯৭ সালে ঢাকার দক্ষিণের দূরবর্তী অঞ্চল নিয়ে একটি পৃথক জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যার সদর দফতর হিসেবে বাকেরগঞ্জ প্রতিষ্ঠা পায়। অর্থাৎ, বাকলা চন্দ্রদ্বীপ জেলা সেই সময়ে সদর দফতর থেকে বাকেরগঞ্জ নামটি ধারণ করে। পরবর্তীতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বাকেরগঞ্জ ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত ছিল ।

জেলার মোট আয়তন ২,৭৯০ বর্গ কি.মি., যা সমগ্র দেশের আয়তনের ২%। আয়তনের দিক থেকে বরিশাল বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ২০তম স্থানে। ছয়টি বিভাগীয় জেলার মধ্যে এটি ৩য় স্থানে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার মধ্যে ৮ম স্থানে রয়েছে।

সিটি করপোরেশন, ১০টি উপজেলা, ৫টি পৌরসভা, ৮৬টি ইউনিয়ন, ৬৬টি ওয়ার্ড, ১,২৫৭টি মৌজা/মহল্লা ও ১,১৭৭টি গ্রাম নিয়ে বরিশাল জেলা। ৩০টি ওয়ার্ড ও ৫০টি মহল্লা নিয়ে বরিশাল শহর গঠিত। এর আয়তন ১৬ বর্গ কি.মি. । ১৯৫৭ সালে বরিশাল পৌরসভা গঠিত হয় এবং ২০০০ সালে তা সিটি করপোরেশনে উন্নিত হয়। জেলায় তিনটি ডাকবাংলো ও ৬টি পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে।

আগৈলঝাড়া, বাবুগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, বানারীপাড়া, গৌরনদী, হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ, মূলাদী, বরিশাল সদর ও উজিরপুর হল বরিশাল জেলার দশটি উপজেলা। যার মধ্যে আয়তনের দিক থেকে হিজলা সবচেয়ে বড় (২০০ বর্গ কি.মি.), যা জেলার মোট আয়তনের ১৯% এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং সবচেয়ে ছোট উপজেলা বানারীপাড়া (৫২ বর্গ কি.মি.) যেটি জেলার মোট আয়তেনের মাত্র ৫% জুড়ে বিস্তৃত। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জোয়ার-ভাটার প্রভাব, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে এর ভিত্তিতে বরিশাল জেলার ১০টি উপজেলাই অন্তর্বর্তী উপকূলীয় (Interior Coast) এলাকায় পড়েছে।

উপজেলা	**১০**
পৌরসভা	**৫**
ইউনিয়ন	**৮৬**
ওয়ার্ড	**৬৬**
মৌজা/মহল্লা	**১,২৫৭**
গ্রাম	**১,১৭৭**

এক নজরে বরিশাল

	বিষয়।	একক	বরিশাল	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	২,৭৮৫	৪৭,২০১	১,৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	১০	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৮৬	১,৩৫১	৪,৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	৫	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	৬৬	৭৪৩	২,৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	১,২৫৭	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	১,১৭৭	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	২৩.৪৮	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	১১.৯৬	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	১১.৫২	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৮৪৩	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০৩.৮	১০৪.৭	১০৬.৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৪.৯	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্য	লাখ	৪.৭৫	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৬.৬	৩.৪৪	৩.৫০	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৯	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘ।	মোট গৃহস্থের (%)	৬৪	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩১	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৮	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	০.৯৬	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	৬৫	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	৩,৭৯১	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১৪,৩৭৭	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর$^{+}$)	হাজার	১,৪৫২	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য ব অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	২৫	২৬	২৮	২০০১ (নির্পেট, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৩৩	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৭	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৬	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৪৪	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	১৯	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৯৬	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ৭ বছর$^{+}$	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৭	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫৯	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৫৫	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ১৫ বছর$^{+}$	মোট জনসংখ্যা (%)	৬০	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৬৪	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৫৭	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	৮৬	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৯১	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৫৯	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালের শয্যাপ্রাপ্তি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন/ শয্যা	২,০৬৫	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫৮	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৮৭	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৮	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৬	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	৯	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৬	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৩৯	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পেট, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- জেলার ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা ৬৮%, যা জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় বেশি।
- জেলার দারিদ্র্যপীড়িত ও অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪% ও ১৯%, যা জাতীয় (৪৯% ও ২৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫২% ও ২৪%) তুলনায় কম।
- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার ৫.৪%, যা জাতীয় হার (৫.৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫.৪%) সমান।
- জেলার মোট গৃহের ৯১% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় হারের (৯১%) সমান ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮৮%) তুলনায় বেশি।
- জেলার মোট বিদ্যুৎ সংযোগের পরিমাণ ৩১%, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) সমান।
- জেলার ভূমিহীনদের সংখ্যা ৪৯%, যা জাতীয় (৫৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৪%) তুলনায় কম।
- সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর) ৫৭%, যা জাতীয় (৪৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫১%) তুলনায় বেশি।
- জেলার মোট আয়তনের মাত্র ৫% প্রত্যন্ত এলাকা বা দ্বীপাঞ্চল।
- জেলার ৫৯% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা জাতীয় (৩৭%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪৬%) তুলনায় বেশি।
- জেলায় গড়ে প্রতি ৬৫ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র রয়েছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় সুবিধাজনক ।
- রাস্তার ঘনত্ব (০.৯৬ কি. মি./ বর্গ কি. মি.), যা জাতীয় (০.৭২% কি. মি./বর্গ কি. মি.) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি. মি./ বর্গ কি. মি.) তুলনায় বেশি।
- হাসপাতালে শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ২,০৬৫ জন, যা জাতীয় অবস্থার (৪,২৭৬ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪,৬৩৭ জন) তুলনায় ভাল।
- নৌ ও বিমান বন্দর আছে।
- নিম্নমাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা।
- বরিশাল জেলা উপমহাদেশের মধ্যে ইলিশের দেশ হিসেবে খ্যাত।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- বরিশাল জেলার মাথাপিছু আয় ১৪,৩৭৭ টাকা জাতীয় আয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় কম।
- মোট আয়ে শিল্প খাতের অবদান ১৮%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) হারের তুলনায় কম।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৮ জন, যা জাতীয় (৪৩) হারের তুলনায় অনেক বেশি এবং সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিবেচনায় প্রায় সমান (৫১-৬৮)।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬ জন , যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) তুলনায় কম।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩৯%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।
- জেলায় শহুরে জনসংখ্যা ১৭%, যা জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলায় রেল সংযোগ নেই।
- খনিজ সম্পদ নেই।
- জেলার পর্যটন আকর্ষণ অনেক কম।

উপজেলা তথ্য সারণী

বিষয়		একক	বরিশাল	উপজেলা			
				আগৈলঝাড়া	বাবুগঞ্জ	বাকেরগঞ্জ	বানারীপাড়া
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	২,৭৮৫	১৬২	১৬৫	৪০২	১৩৪
	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	সংখ্যা	১৫২	৫	৬	২৩	১৭
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	১,২৫৭	৭৯	৮১	১৭৬	৯৩
	গ্রাম	সংখ্যা	১,১৭৭	৯৬	৮৯	১৭৪	৭৬
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	২৩.৪৮	১.৪৯	১.৪৭	৩.৫৪	১.৫৩
	পুরুষ	লাখ	১১.৯৬	০.৭৪	০.৭৪	১.৭৪	০.৭৬
	নারী	লাখ	১১.৫২	০.৭৪	০.৭২	১.৭৯	০.৭৬
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	৮৪৩	৯২৪	৮৯৪	৮৮২	১১৪০
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০৩.৮	১০০	১০৩	৯৭	১০১
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৪.৭৫	০.৩১	০.২৯	০.৭২	০.৩১
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৪.৯	৪.৭২	৪.৯৩	৪.৮৭	৪.৮৪
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ কৃষিজীবী ঘরের%	৬.৬	১.৯	৩.৯	৩.২	২.৯
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়াল সম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৯	৪৪	৫৪	৫৬	৫৫
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬৪	৭৫	৭০	৭০	৫৬
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১০	৬.০৮	১.৩৭	১.৫৪	৬.৩৪
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১,৮১৭	১৩০	১৬৩	৩৩৪	১৪৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৪০৯	৩১	৩৩	৭২	৩০
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৬৪	৪	৪	৯	৪
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গৃহস্থের (%)	৩৩	৩৪	২৭	২৫	৩৪
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	৭৯	৮৭	৮০	৭৬	৮০
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	২১	১৩	২০	২৪	২০
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	১,৩২,২৩৫	১২,২৪২	৮,২৩২	২১,৮৮৯	৭,৫৩৭
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৩৮	৫৭	২৯	২৯	৫৯
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৪৯	৩৮	৫১	৬২	২৯
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	১৪	৫	১৯	৯	১২
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	১০,০০০	৫,০০০	৭,০০০	৫,০০০	৭,০০০
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৭	৬০	৫৮	৬২	৫৫
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৬	৮৮	১০১	৮৮	১০১
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৮	৮৮	১০৭	৮৭	১০১
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	২৭,০৬৭	২,০২০	২,২৬০	৪,৫২৭	২,০৭৬
	নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৭৪	৮৫	৭৬	৭৪	৮০
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	১৬	৩০	১২	১৬	১৭

উপজেলা						তথ্য সূত্র ও বছর
গৌরনদী	হিজলা	মেহেন্দীগঞ্জ	মুলাদী	সদর	উজিরপুর	
১৪৪	৫১৫	৪৩৬	২৬১	৩০৮	২৪৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৬	৭	২২	৭	৪০	৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৩১	১৪১	১৪২	৯৮	১৯৮	১১৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১১০	১১৩	১৫০	১০৯	১৩৭	১২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.৭৯	১.৭৭	২.৯৬	১.৭৮	৪.৬৯	২.৪২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৯০	০.৯০	১.৫০	০.৮৮	২.৫১	১.২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৮৮	০.৮৬	১.৪৬	০.৮৯	২.১৮	১.১৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১,২৪৩	৩৪৩	১,৫২৮	৬৮৪	৬৮০	৯৭৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১০৩	১০৪	১০৩	৯৯	১১৫	১০৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৩৭	০.৩৪	০.৫৯	০.৩৬	০.৯৪	০.৪৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৪.৭৭	৫.১৫	৫.০১	৪.৯৪	৫.০০	৫.০০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২.৬	২.৪	২.৭	২.০	২.৭	২.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৪৭	৩২	৪১	৪৩	৫৭	৫১	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৭২	৫১	৫৫	৬০	৬৭	৪৩	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১১.৭৪	১.৩৬	০.৮১	২.০৩	৩৫.০৫	৬.৪০	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১৩৫	৯৮	২৩৯	১৩৬	২৪৬	১৮৭	২০০১(প্রা.শি.অ., ২০০৩)
২৫	১৭	৩৫	৩৬	৮২	৪৮	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৫	১	৫	৬	১৬	১০	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৩৭	৩৭	৩৮	৩৬	২৬	৩৩	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৮১	৭৯	৭২	৮১	৭০	৮৪	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
১৯	২১	২৮	১৯	৩০	১৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৮,৫৪৮	১৩,৪৬৪	১৮,৭৯০	১১,৯৯০	১৫,২০৭	১৪,৩৩৩	২০০৩,(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
৩২	২৫	৩০	৪২	৩৬	২৯	২০০৩,(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
৫৯	৭৫	৫০	৫০	৪৭	৩৭	২০০৩,(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
১০	-	২০	৮	১৭	৩৪	২০০৩,(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০	৪৫,০০০	৫,০০০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৬১	৩৮	৪৪	৫৩	৬৩	৬২	২০০১(প্রা.শি.অ., ২০০৩)
৯৫	১০০	৯৮	৯৬	৯৭	১০১	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
৯৬	১০৯	৯৯	৯৭	৯৭	১০৪	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
২,২৭৮	২,৩৯৪	৩,৬৭৬	২,৩৩৩	২,৭৩৬	২,৭৬৯	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৭৭	৬৬	৬৪	৭৭	৭৪	৭৯	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১৪	৬	৬	৫	৩১	১৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

ধান-নদী-খাল এই তিনে বরিশাল। বরিশালের প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষের জীবনযাত্রার ধরন এই ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলে। ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ, জোয়ার-ভাটার জলাভূমি বা নদী মোহনা, নালা, খাল-বিল, চরাঞ্চল এবং অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ - এ সবই বরিশাল জেলাকে উপকূলীয় অঞ্চলে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, জেলার কৃষি ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। কেননা এখানকার কৃষির ধরন গড়ে উঠেছে ভূমি বৈচিত্র্য ও পানি-মাটির লবণাক্ততাকে কেন্দ্র করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

নদ-নদী : অসংখ্য নদী-নালা বরিশাল জেলায় জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। জেলার অর্থনীতিতে এ নদীগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। জেলার প্রধান নদী হল মেঘনা, আড়িয়ালখাঁ তেঁতুলিয়া, টরকী, কীর্তনখোলা ও কালিজিরা। প্রধান এ নদীগুলো আবার অসংখ্য নালা ও খালে বিভক্ত হয়ে সমস্ত জেলা জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবং খাঁড়ি, শাখা নদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরের পড়েছে। জেলার নদী পদ্ধতি ছোট ছোট নালা-খাড়ির স্রোত ধারার উপর নির্ভরশীল। এসব নদীতে সারা বছর ধরে জোয়ারভাটা খেলে এবং নাব্য থাকে। জেলায় মোট ১৬০ বর্গ কি.মি. নদীপথ আছে। এই নদী পথ জেলার মোট আয়তনের ৬%।

মেঘনা : প্রমত্তা মেঘনা নদী আসামের নাগামণিপুর পাহাড়ে উৎসারিত হয়ে সিলেটের অমলসিদ সীমান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর পর্যায়ক্রমে সিলেট, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, চাঁদপুর হয়ে বরিশাল, ভোলার উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। মেঘনা নদী বরিশালের মুলাদী, মেহেন্দীগঞ্জ ও হিজলা উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এ নদীর উপর জেলার নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য সম্পদ, বনজ সম্পদ, সেচ ব্যবস্থাপনা, বন্যার পানি নিষ্কাশন, পানীয় জল সরবরাহ, শিল্প কল কারখানার উৎপাদন নির্ভরশীল। তবে, এককালের শান্ত নদী মেঘনার রূপ আজ অনেক বদলে গেছে। নদীভাঙন, নাব্যতা হ্রাস, উজানের পানির ঢল ও সামুদ্রিক জোয়ারের ফলে উজানমুখী চাপে সৃষ্ট বন্যা ও প্লাবন মেঘনার ভয়াল রূপের বহিঃপ্রকাশ।

প্রধান নদী	**মেঘনা, আড়িয়ালখাঁ তেঁতুলিয়া, টরকী, কীর্তনখোলা, কালিজিরা ও বরিশাল-বুড়িশ্বর**
নদীর দৈর্ঘ্য	**১৬০ বর্গ কি.মি.**
উৎপত্তি স্থান	**গঙ্গা, মেঘনা এবং পদ্মা**
উল্লেখযোগ্য নালা	**নড়িয়া খাল, পালং খাল, ময়নাকাটা, ভুবনেশ্বর, কুমার, কাইলার ও নয়াভাংগি**

আড়িয়াল খাঁ : পদ্মার পূর্ব প্রান্তের প্রধান শাখা নদী আড়িয়াল খাঁ এক সময় 'আবদাল খাল' হিসেবে পরিচিত ছিল। আড়িয়াল খাঁ নদী জেলার পশ্চিমে 'টরকী' নদী এবং পূর্বে আড়িয়াল খাঁ নামে প্রবাহিত। ভাঙনপ্রবণ এ নদীটির তিনটি উৎসমুখ রয়েছে। এগুলো হল পিঁয়াজখালী (আকোট), হাজারখাল (বটেশ্বর) ও ডুবুলদিয়া। মূলত পিঁয়াজখালী ও ডুবুলদিয়া স্রোত দুটি মাদারীপুরের অদূরে শম্বুক নামের স্থানে মিলিত হয়েছে এবং এটিই পরবর্তীতে বরিশালের মূলাদী উপজেলায় মেঘনা নদীতে মিলিত হয়ে তেঁতুলিয়া নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। নড়িয়া খাল, পালং খাল, ময়নাকাটা, ভুবনেশ্বর, কুমার, কাইলার ও নয়াভাংগি এ নদীর কয়টি উল্লেখযোগ্য নালা।

কীর্তনখোলা : অন্যদিকে গঙ্গার তিনটি প্রবাহ নলিনী, হলিদিনী ও পাবনীর অন্যতম ধারা কীর্তনখোলা নদী বরিশাল শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম নলছিটি পর্যন্ত কীর্তনখোলা নামে প্রবাহিত হয়েছে। পরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম ধারণ করে সবশেষে হরিণঘাটা নামে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এক সময় কীর্তনখোলা নদী প্রায় ১ কি.মি. প্রশস্ত ছিল। অথচ, বিগত শতাব্দীতে এ নদীতে চর পড়ে প্রশস্ততা অর্ধেকের বেশি কমে গেছে এবং সেই সাথে নদীর গভীরতা, নাব্যতা ও স্রোত প্রবাহ কমে গেছে। ভাঙনপ্রবণ এ নদীটি তার গতিপথে বিপুল পরিমাণে পলি বহন করে। কীর্তনখোলার পশ্চিম তীরে আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। এর পানি সমতলের বিপদসীমা ২.৫ মিটার এবং সমগ্র বরিশাল জেলার পানি এ নদী দিয়ে অতি অল্প সময়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে, যা বরিশাল জেলাকে ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা করে আসছে যুগ যুগ ধরে।

কালিজিরা : কীর্তনখোলা থেকে শাখা নদী কালিজিরা'র উৎপত্তি। কীর্তনখোলার গতিপথে উভয় তীরে বর্তমানে দুটি করে শাখা রয়েছে। পূর্ব তীরে বুখাই নগর ও পটুয়াখালী বাকেরগঞ্জ খাল এবং পশ্চিমতীরে মীরগঞ্জ বা মাধব নদী এবং কালিজিরা শাখা নদীর অবস্থান। কালিজিরা বর্তমানে প্রায় স্রোতহীন।

বরিশাল-বুড়িশ্বর : জেলার অরেকটি প্রধান নদী বরিশাল-বুড়িশ্বর, যেটি কীর্তনখোলা নদী থেকে অর্থাৎ বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার দপদপিয়া থেকে উৎসারিত হয়েছে। প্রায় ৩ কি.মি. প্রশস্ত ও ১৫৮ কি.মি. দীর্ঘ এ নদীটিতে সব সময় জোয়ার-ভাটা খেলে। নদীটির জায়গায় জায়গায় চর সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া নদীটি ভাঙনপ্রবণ। এই নদীতে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, এর তীরে বাকেরগঞ্জ উপজেলার সরকারি অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, খাদ্য গুদাম ও হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। বর্ষাকালে বলেশ্বর নদীর পানি লবণাক্ত থাকে।

তেঁতুলিয়া : ৬ কি.মি. প্রস্বস্ত ও ৮৪ কি.মি. দীর্ঘ তেঁতুলিয়া নদী ভোলা জেলার উত্তরে মেঘনা নদী থেকে উৎসারিত হয়েছে। তেতুঁলিয়া নদী বাকেরগঞ্জের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পরবর্তীতে আগুনমুখা ও রামনাবাদ নদীতে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই নদীর মাধ্যমে বরিশালের মূল ভূ-খণ্ড ও ভোলা জেলা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। অত্যন্ত ভাঙনপ্রবণ এ নদীটিতে চর পড়ে যাওয়ায় নৌ-চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। সারা বছর ধরে এ নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলে।

খাল ও দোন : বরিশালে অনেক বড় বড় খাল ও দোন রয়েছে। প্রবাদ রয়েছে যে, ধান-নদী-খাল এ নিয়ে বরিশাল। বানারীপাড়া, লাখুটিয়া, গৌরনদী, সরিকল, কাকচিরা প্রধান কয়টি খাল। দুই নদীর মিলিত স্রোতকে স্থানীয় ভাষায় দোন বা ভারানী বলা হয়। আড়াআড়ি নদীগুলো স্রোত হারিয়ে দোনে পরিণত হয়।

বিল : জেলায় প্রধান কয়টি বিল রয়েছে। মূলত অতীতের নদী মরে গিয়ে এ বিলের সৃষ্টি। উজিরপুরের সাতলা, গৌরনদীর বাগদা বিল উল্লেখযোগ্য। জোয়ার-ভাটার প্রভাবে বর্তমানে সাতলা-বাগদা বিল ভরে যাচ্ছে। বিলগুলো খালের পাড়ে বা তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় জোয়ারের জলে পরিপূর্ণ ও ভাটায় শুকনো পড়ে থাকে। ফলে জোয়ারের পলি জমে বিলের বুক উঁচু হয়ে যায় এবং এতে হোগলা, নলখাগড়া জন্মাতে শুরু করে। এ কারণে অদূর ভবিষ্যতে জেলার প্রাচীন বিল বা জলাভূমির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে বলে আশংকা রয়েছে। আগৈলঝাড়ার বাকল, বাগধা, রাজিহার, রামশীল, রাজাপুর, বাশাইলের বিল- হাওড় উল্লেখযোগ্য।

চরাঞ্চল : বরিশাল জেলার অন্যতম ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য চরাঞ্চল। এখানে দূরবর্তী চরাঞ্চল ও মূল ভূমি সংলগ্ন চরাঞ্চল দুই-ই রয়েছে।

মূল ভূমি সংলগ্ন চরাঞ্চল : জেলার প্রধান কয়টি মূল ভূমি সংলগ্ন চর হল চর আলিমাবাদ, আনধার মানিক, ভাসান চর, গোবিন্দপুর, হরিণাথপুর, হিজলা গুরাবদী ইত্যাদি। এই চরগুলোর মোট আয়তন ৩৩৭ বর্গ কি.মি., যা সমগ্র জেলার আয়তনের মাত্র ১২%। এই চরগুলোতে প্রতিরক্ষা বাঁধ নেই। কেবলমাত্র হিজলা উপজেলার চর হরিণাথপুর ইউনিয়নের মাত্র দুটো মৌজায় প্রতিরক্ষা বাঁধ রয়েছে। নদী ভাঙন, নতুন জমি জেগে ওঠা, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়া, জোয়ার ইত্যাদি চরাঞ্চলের প্রধান কয়টি দুর্যোগ। নদী-নালার পাশাপাশি চরগুলোতে অনেক পুকুর ও জলাশয় রয়েছে। কৃষি, মাছ ধরা, দিন মজুরি ও ব্যবসা জনগণের প্রধান পেশা। চরগুলোর সম্ভাবনাময় কয়টি দিক বলতে কৃষি, নদী ও উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ, নৌ ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, ম্যানগ্রোভ বন, উর্বর মাটি, আঙিনার গাছ গাছালিকে বুঝানো হয়।

মূল ভূমির সাথে সংযুক্ত চরাঞ্চল	
প্রধান চর	চর আলিমাবাদ, আনধার মানিক, ভাসান চর, গোবিন্দপুর, হরিণাথপুর, হিজলা গুরাবদী
আয়তন	৩৩৭ বর্গ কি.মি.
% মোট আয়তন	১২%
প্রধান পেশা	কৃষি, মাছ ধরা, দিন মজুরী, নোকা চালান, ক্ষুদ্র ব্যবসা
দুর্যোগ	নদী ভাঙন, নতুন জমি জেগে ওঠা, জোয়ার

দূরবর্তী চরাঞ্চল : চর গোপালপুর ও জঙ্গলিয়া, দরিচর, খাজুরিয়া, ধুলখোলা, শায়েস্তাবাদ ও চরমোনাই বরিশালের প্রধান কয়টি দূরবর্তী চরাঞ্চল। এদের মোট আয়তন ১৮৮ বর্গ কি.মি., যা জেলার মোট আয়তনের ৭%। এই চরগুলোতে প্রতিরক্ষা বাঁধ নেই। নদী ভাঙন, নতুন জমি জেগে ওঠা, প্লাবন এখানকার প্রধান কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নদী-নালা (লতা, মাশকাটা, তেঁতুলিয়া, আড়িয়াল খাঁ, বুখাইনগর নদী) ও উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ, উর্বর মাটি, ম্যানগ্রোভ বন, ধান ও রবিশস্য, ফলজ ও বনজ গাছ চরাঞ্চলের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। উল্লেখ্য, মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলাধীন দরিচর, খাজুরিয়া এবং হিজলা উপজেলার ধুলখোলা চরে ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে। কৃষিকাজ, বর্গাচাষ, মাছ ধরা, পশুসম্পদ পালন, দিন মজুরি, নৌকা চালান চরের লোকদের প্রধান পেশা।

দূরবর্তী নদী বিধৌত চরাঞ্চল	
প্রধান চর	চর গোপালপুর ও জঙ্গলিয়া, দরিচর খাজুরিয়া, ধুলখোলা, শায়েস্তাবাদ, চর মোনাই
আয়তন	১৮৮ বর্গ কি.মি.
% মোট আয়তন	৭%
প্রধান পেশা	কৃষি কাজ, বর্গা চাষ, মাছ ধরা, দিন মজুরি, নৌকা চালান
দুর্যোগ	নদী ভাঙন, ভরা জোয়ার, নতুন জমি জেগে ওঠা
সম্ভাবনা	নদীর মাছ, ম্যানগ্রোভ বন, উর্বর মাটি, মানব সম্পদ
প্রতিকূলতা	অসংরক্ষিত এলাকা, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা

পুকুর : জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের পুকুর। যার মোট এলাকা ৭,০৩৮হেক্টর, এর মধ্যে মাছ চাষ করা হয় ৪,৭৪০ হেক্টর পুকুরে। জেলার পরিত্যক্ত পুকুরের পরিমাণ ৮৯৩ হেক্টর।

মোট পুকুরের পরিমাণ	৭,০৩৮ হে.
মাছ চাষের পুকুর	৪,৭৪০ হে.
মাছ চাষযোগ্য পুকুর	১,৪০৫ হে.
পরিত্যক্ত পুকুর	৮৯৩ হে.

জলবায়ু : বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণের অন্যান্য জেলার মত বরিশালের জলবায়ু উষ্ণ। এখানে গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম ও শীতকালে মৃদু শীত অনুভূত হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শীতকাল। শীতের রাতে সামুদ্রিক বাতাসের প্রভাবে কুয়াশা পড়ে এবং মার্চ মাস পর্যন্ত এটি বজায় থাকে। শীতকালে জেলার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৭° সে. ও ১৪° সে.। কিন্তু মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত স্থায়ী গ্রীষ্মকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ২৪° সে.। জেলার বার্ষিক গড় আর্দ্রতার পরিমাণ ৮৪% এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে। জেলার বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের বিভিন্নতা বরিশালের জলবায়ুর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে সাধারণভাবে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১,৯১৮ মি.মি.।

মাটি : বরিশালের মাটির ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে এইচ বেভারীজ বলেন, "সুগন্ধা নদীর পলিমাটি থেকেই এর পূর্ব পাড়ের বাকলা চন্দ্রদ্বীপ জেলার ভূ-প্রকৃতি গঠিত হয়"। বরিশাল জেলা পরিণত বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার মাটি জোয়ার-ভাটার বন্যাপ্লাবন ভূমির মত এবং কোথাও কোথাও লবণাক্ত। জেলার মাটির ধরন সাধারণত উর্বর পলিময় এবং এতে কম বেশি বালু ও কাদার পরিমাণও রয়েছে। জেলায় তিন ধরনের মাটি রয়েছে। জেলার উত্তরাঞ্চলের মাটি পুরনো গাঙ্গেয় বন্যা প্লাবন ভূমির মাটি পলিময় এঁটেল ধরনের। কিন্তু জেলার মধ্যভাগের নিম্ন মেঘনা জোয়ার-ভাটার বন্যা প্লাবন ভূমির মাটি পলিময় এঁটেল, কিন্তু লবণাক্ত নয়। অন্যদিকে, জেলার দক্ষিণাঞ্চলের মাটি পুরনো নিম্ন মেঘনার জোয়ার-ভাটার বন্যা প্লাবন অঞ্চলের মাটি ধূসর বর্ণের, পলিযুক্ত এবং ঈষৎ লবণাক্ত। জেলার ভূ-উপরিস্থ পানিতে লবণাক্ততা নেই বললেই চলে। জেলার মাটিতে লবণের পরিমাণ ০-৪ পি.পি.এম (এস.আর.ডি.আই, ২০০১)।

মাটির ধরন	পুরনো গাঙ্গেয় বন্যা প্লাবন ভূমির মাটি নিম্ন মেঘনা জোয়ার-ভাটার বন্যা প্লাবন ভূমির মাটি পুরনো নিম্ন মেঘনার জোয়ার ভাটার বন্যা প্লাবন অঞ্চলের মাটি
প্রধান বৈশিষ্ট্য	পলিময় এঁটেল, ধূসর বর্ণের এবং কোথাও কোথাও ঈষৎ লবণাক্ত
মাটিতে লবণের পরিমাণ	০-৪ পি.পি.এম

বন ভূমি : জেলায় প্রাকৃতিক বনভূমি নেই বললেই চলে। এই ম্যানগ্রোভ বন ধবংস হয়ে গড়ে উঠেছে জনপদ। তবে, বৃহত্তর বরিশাল উপকূলীয় বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় টেকনাফ থেকে বলেশ্বর নদীর উত্তর অঞ্চল পর্যন্ত ম্যানগ্রোভ বনায়ন শুরু হয়েছে। এর আওতায় বরিশাল বিভাগের ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা জেলা রয়েছে। এ ছাড়া সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় জেলার প্রতিরক্ষা বাঁধে গাছ লাগানোর কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, সাতলা-বাগদা সেচ প্রকল্পের আওতায় জেলায় সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি করা হয়।

উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্য : বরিশাল জেলা উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে ততটা সমৃদ্ধ নয়। অথচ একসময় বরিশালে সুন্দরবন ছিল। ইংরেজ শাসনামলের শুরুতে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চলে সুন্দরবন ছিল। সুগন্ধা নদীর বুকে জেগে ওঠা চরের পলিমাটি ও বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত জল এই ম্যানগ্রোভ বন সৃষ্টি করে। এই সুন্দরবন বিলীন হয়ে যাবার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, ইংরেজ সরকার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে বাকেরগঞ্জ-পটুয়াখালীর দক্ষিণ অঞ্চলে সুন্দরবন বন্দোবস্ত দেয়। ফলে, বন কেটে জনবসতি স্থাপন শুরু হয়। উল্লেখ্য, মেঘনা- ব্রহ্মপুত্রের মিঠাপানির প্রভাব আর উঁচু জমির কারণে সুন্দরবন কেটে চাষাবাদের জমিতে পরিণত করা হয় । ১৯৩৭ সালে পটুয়াখালীর সুন্দরবন সম্পূর্ণরূপে বন্দোবস্ত দেয়ায় বরিশালের সুন্দরবন প্রায় নির্মূল হয়ে যায় (বরিশালের ইতিহাস, ৪৬)।

বরিশালের দক্ষিণ অঞ্চল নিয়ে পটুয়াখালী জেলা সৃষ্টির কারণেও তৎকালীন বাকেরগঞ্জের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সীমিত হয়ে যায়। বর্তমানে সুন্দরবন না থাকলেও সুন্দরবনের কয়টি গাছপালার অস্তিত্ব এখনো আছে। গাব, হরিতকি, পসুর, কেওড়া, বয়রা, কড়ই, সোনালু, জিন এবং লোহা খয়রা এর মধ্যে অন্যতম। বর্ষায় এই ম্যানগ্রোভ গাছগুলো নদীর পানিকে জনপদে উপচে পড়তে প্রতিরোধ করে।

উদ্ভিদ বৈচিত্র্য	ম্যানগ্রোভ গাছ : গাব, হরিতকি, পসুর, কেওড়া, বয়রা, কড়ই, সোনালু, জিন এবং লোহা খয়রা ফলজ গাছ : আম, তাল, সুপারি, কাঁঠাল, আমড়া, খেজুর, নারিকেল, কালজাম, জাম্বুরা, পেয়ারা বনজ গাছ : কার্পাস, মান্দার, কদম, তেঁতুল, হিজল, পলাশ ও হাতিম
প্রাণী বৈচিত্র্য	উড়ক্কু, শেয়াল, খেঁকশিয়াল, বেজি, কাঠ বেড়ালী, ইঁদুর

উঁচু জমিতে প্রধানত বাঁশ, তাল, সুপারি, নারিকেল, কার্পাস গাছ জন্মে। লোনা পানির প্রভাবমুক্ত এলাকায় আম, কাঁঠাল, আমড়া, খেজুর, নারিকেল, কালজাম, জাম্বুরা, পেয়ারা, জাম, তেঁতুল, বেল ইত্যাদি ফলজ গাছ প্রধানত দেখা যায়। জেলার ঘরবাড়ির আঙ্গিনায় বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছালি, বাঁশ ঝাড় ও কলাগাছ দেখা যায়। অন্যদিকে বনজ গাছের মধ্যে মান্দার, কদম, আলমন্ত, বট, পিপুল, তেঁতুল, হিজল, পলাশ ও হাতিম গাছ অন্যতম। নিম ও বক ফুল প্রধান ঔষধি গাছ। পরিত্যক্ত জলাশয়, নিম্নাঞ্চল ও ভেজা মাটিতে ঘাস, মাকনা, হোগলা ও গোলপাতা জন্মে। পুকুর, ডোবা ও বিলে কচুরীপানা, ক্ষুদি পানা, পদ্ম ও শাপলা ফুল ফোটে।

প্রধান স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম হল উড়ক্কু, শেয়াল, খেঁকশিয়াল, বেজি, কাঠ বেড়ালী ও ইঁদুর ইত্যাদি। তবে এক সময় বরিশালে সজারু, গেছো বিড়াল, বাংলা শিয়াল দেখা যেত যা আজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হলুদ কচ্ছপ, টিকটিকি, ডোড়া সাপ, অজগর সরীসৃপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

জেলার ভেজা মাটি, বিল, জলাশয় ও খাল বিভিন্ন ধরনের পাখীদের আবাসভূমি। এখানে দোয়েল, বাবুই, টুনটুনি, লেচ নাচানি, টিলা মুনিয়া, ভাট শালিক, চড়ুই, কালিপেঁচা, ছোট ফিঙ্গে, হলদে পাখী, কাঠ ঠোকড়া, টিলা ঘুঘু, ডাহুক, বক, পানকৌরি প্রভৃতি পাখী সচরাচর দেখা যায়। এ ছাড়া ও শীত মৌসুমে এখানে অতিথি পাখীরা বেড়াতে আসে। অতিথি পাখীদের মধ্যে বক, কানীবক, বালি হাঁস, চিতি হাঁস খুন্তিহাঁস, গিড়িয়া হাঁস, লেন্‌জা হাঁস, খঞ্জন, চখাচখী, বাদামী কোশাই পাখী অন্যতম।

নদী-নালার মাছ : বরিশালে উপমহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। এক সময় পায়রা, বিশখালী, তেতুলিয়া, শাহবাজপুর, আগুনমুখা নদী ইলিশের জন্য বিখ্যাত ছিল। জেলার বিভিন্ন ধরনের উন্মুক্ত জলাশয় রয়েছে, যা মাছের প্রাকৃতিক আবাসভূমি হিসেবে বিবেচিত। বর্ষাকালে ধান ক্ষেতে বিভিন্ন দেশী জাতের মাছ চাষ হয়।

নদী-নালা, বিল ও হাওড়ের মাছের মধ্যে ইলিশ, রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবাউশ, পাংগাস, আইর, বোয়াল, গজার, শোল, মাগুর, শিং, বেলে, টেংরা, সরপুটি এবং ফলি মাছ প্রধান। তবে জোয়ার-ভাটার খালের কয়টি বিশেষ মাছের মধ্যে শিলন্দ, রিটা, তোপশে, ভেটকি অন্যতম। বর্ষায় জেলার নদীগুলোতে হাঙর দেখা যায়। এরা সাধারণত সুন্দরবন এলাকা থেকে এ অঞ্চলে চলে আসে।

নদী-নালা-বিল ও হাওড়ের মাছ	**ইলিশ, রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবাউশ, পাংগাস, আইর, বোয়াল, গজার, শোল, মাগুর, শিং, বেলে, টেংরা, সরপুটি এবং ফলি**
জোয়ার-ভাটার খালের মাছ	**শিলন্দ, রিটা, তোপশে ভেটকি**

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : বরিশাল জেলা এগ্রোইকোলজিক্যাল জোন ১২, ১৩ অর্থাৎ নিম্ন গঙ্গার নদী প্লাবন এলাকা ও গাঙ্গেয় জোয়ার-ভাটার এলাকায় অবস্থিত। জেলার মোট কৃষি জমির পরিমাণ ১,৩২,২৩৫ হে. (কৃষি অধিদপ্তর, ২০০১)। জেলার কৃষি-জমির ৩৮% এক ফসলী এবং ৪৯% দোফসলী এবং ১৪% তিন ফসলী জমি। প্রথম

শ্রেণীর প্রতি ০.০১ হে. জমির চলতি বাজার মূল্য ১০,০০০ টাকা (বাংলা-পিডিয়া, ২০০৩)।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিবিড় বোরো চাষ কর্মসূচী-র আওতায় বরিশাল জেলার মোট ৫৩,৮০০ হেক্টর জমিতে নিবিড় বোরো চাষের উদ্যোগ নিয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লক্ষ ৭ হাজার মেট্রিক টন। এ ছাড়া বরিশাল জেলার মোট ১,৪০০ হেক্টর জমিকে নিবিড় গম চাষ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। কৃষি সম্প্রারণ অধিদপ্তর এই জমি থেকে মোট ২,৯৮২ মে: টন গম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। স্থানীয় বাজারে বীজ সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও অতিবৃষ্টি ও নিম্নচাপ এ নিবিড় চাষ কর্মসূচীর জন্য হুমকিস্বরূপ -এ বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করে তোলা প্রয়োজন।

কৃষি জমি	১,৩২,২৩৫ হে.
সেচের জমি	৪৬,০৪৭ হে.
শস্য নিবিড়তা	১৮২

এখানে শস্য নিবিড়তা (Cropping intensity) ১৮২। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুর্যো (১৯৯৬)-র হিসাব অনুযায়ী জেলার মোট ২৪% জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করা হয়। এলাকার জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা না থাকায় বহু জমিই অব্যবহৃত, অতি ব্যবহৃত বা ভুল ব্যবহার হচ্ছে। ফলে কৃষকের অর্থ ও শ্রম - এই দু'য়েরই ক্ষতি হচ্ছে। জেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সমন্বিত কীট পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা Integrated Pest Management (IPM) ব্যাপক প্রচলন শুরু করা প্রয়োজন। কেননা কৃষকদের অজ্ঞতা, অসচেতনতা আর তথ্যের অভাবে প্রতি বছর এ জেলায় বিপুল পরিমাণ ফসল বিনষ্ট হয়। সমন্বিত কীট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রধান ফসল : জোয়ার-ভাটার দেশ বরিশালের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। মোট ৭৮% গৃহস্থালি কোন না কোন ভাবে ফসল উৎপাদনের কাজে জড়িত। বর্ষা কালে ও ভরা জোয়ারে কৃষি জমি ডুবে যায় এবং পলি পড়ে তা আরো উর্বর হয়। উল্লেখ্য, ১৮৮৯-র সময়ে রেজিস্ট্রেশন করে যে চাল রপ্তানি হয় সে হিসেবে বরিশাল বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানিকারক জেলা ছিল। কিন্তু, তা সত্ত্বেও জেলার কৃষকরা বিত্ত বৈভব্যের মধ্যে বাস করত না। কেননা, যাচনদার (যে ধানের চেহারা দেখত) এবং কয়াল (যে ধান মাপত)-দের প্রতারণার শিকার ছিল জেলার আপামর নিরীহ কৃষকরা। উদ্বৃত্ত চাল চলে যেত কলকাতায়। আর তাই জেলার অর্থনৈতিক উন্নতি হয়নি। ইংরেজদের দেয়া খেতাব "বাংলার শস্যভাণ্ডার বরিশাল" কেবল প্রবাদই থেকে গেছে।

প্রধান ফসল বলতে ধান, গম, পাট, ডাল, তৈলবীজ, সবজি, মশলা, আখ, তামাক ইত্যাদিই প্রধান। ধানের মধ্যে আমন ধান প্রধান এরপরে রয়েছে আউশ ও বোরো। জেলায় কিছু ফলজ গাছের বাগান আছে। আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি, আমড়া, কলা ও পেয়ারা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় ও উচ্চ ফলনশীল জাত বা HYV ধান, গম, সবজি, মশলা, তামাক জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল।

প্রধান অর্থকরী ফসল	উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান, গম, সবজি, মশলা, তামাক
প্রধান ফসল	ধান (আমন, আউশ, বোরো ও উচ্চ ফলনশীল জাত), গম, পাট, ডাল, তৈলবীজ, সবজি, মশলা, আখ, তামাক
রপ্তানি ফসল	ধান, মাছ, পান, পেয়ারা, নারিকেল, সুপারি ও আমড়া

ফসল	জমির পরিমাণ (হে.)	উৎপাদনের পরিমাণ (মে .টন)
গম	১১,৪২৫	১৭,৭৫০
ডাল	৬৩,১২০	৩৭,৩২৫
তৈলবীজ	৪০,২৩৮	৩৭,৭৬৫
মশলা	২৮,০৪৬	১৯,৫৪০
আখ	৩,৬০০	৭৭,৫৬০
পাট	১,৩৩৮	৮,৮৬০
সুপারি	৮,০০৮	৭,১৫৫
পান	২,৭৪৮	১১,৩১০
গ্রীষ্মকালীন সবজি	২,৯৬৯	১২,২৫০
শীতকালীন সবজি	৬,৪৮৩	৩১,৩১০
অন্যান্য খাদ্যশস্য	১৪,৪৯৮	১,৪৬,৭৪০
মোট	১৮২,৪৭৩	২৬০,৮২৫

সদর উপজেলার চরমান্দি গ্রাম বরিশালের প্রসিদ্ধ 'বালাম' চাল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ধান, মাছ, পান, পেয়ারা, নারিকেল, সুপারি ও আমড়া প্রধান রপ্তানি ফসল ও দ্রব্য। ১৯৯৮-৯৯ সালে বরিশাল জেলায় উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ও কৃষি জমির পরিমাণ এখানে তুলে ধরা হল।

সুপারি ও নারিকেল : বরিশালের বিভিন্ন বন্দর দিয়ে "টাটি" (পাকা শুকনো সুপারি) এবং মগাই (পাকা সুপারি পানিতে ভিজিয়ে পরে শুকানো সুপারি) সুপারি কলকাতা, চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুনে রপ্তানি হতো। সে সময় হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জ সুপারির সবচেয়ে বড় বাগান ছিল। ১৮৯৪ সালে এক অজ্ঞাত রোগে হাজার হাজার সুপারি গাছ মরে যায়। তবু বরিশাল জেলা সমগ্র উপকূল অঞ্চলে সুপারি উৎপাদনে এগিয়ে রয়েছে।

এক সময় বরিশালের সর্বত্র প্রচুর নারিকেল জন্মাত যা কলকাতা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ঢাকা, পাবনা-য় চালান দেয়া হতো। এ ছাড়া বরিশাল খেজুর, আখ ও পানের জন্যও প্রসিদ্ধ। বরিশালের উত্তর ভাগে প্রচুর পান জন্মে। অন্যান্য শস্যের মধ্যে মরিচ, তিল, সরিষা, মসুরি, কলাই, কচু ও অন্যান্য রবি ফসল অন্যতম। বাবুগঞ্জের মসুরী ডাল এক সময় সারা বাংলাদেশের মধ্যে বিখ্যাত ছিল।

সবজি : সবজি চাষে স্বল্প পুঁজিতে বিপুল লাভ অর্জন করা সম্ভব বলে জেলার বহু ছাত্রই আজ স্বনির্ভরতা অর্জন ও নিজেদের লেখাপড়ার খরচ যোগনোর উপায় হিসেবে সবজি চাষকে বেছে নিয়েছে। তারা ১০টি উপজেলায় সবজি চাষে লাভ অর্জনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ১০,০০০ উদ্যেমী তরুন সবজি চাষে নিয়োজিত ও মোট ৫৯,০০০ হেক্টর জমিতে সবজি চাষ করেছে ও প্রধানত টমেটো, ঢেড়শ, কুমড়া, করলা, চিচিংগা, শসা, বরবটি, ধনিয়া পাতা, পালং শাক, বটি শাক, চিনা শাক, কপি ও বেগুন চাষ করা হয়।

উপজেলাভিত্তিক সবজি চাষের জমির পরিমাণ

উপজেলা	জমির পরিমাণ (হে.)
বরিশাল সদর	৭০০
বাবুগঞ্জ	৭০০
বানারী পাড়া	৬০০
মেহেন্দগঞ্জ	৪০০
মূলাদী	৪০০
আগৈলঝাড়া	৩০০
গৌরনদী	৫০০
বাকেরগঞ্জ	৮০০
উজিরপুর	৫০০
মোট	**৫৯,০০০**

সরিষা : কৃষি অধিদপ্তর জেলার ৩,০০০ হেক্টর জমি সরিষা চাষের আওতায় এনেছে। এ থেকে প্রায় ২,৭০০ মেট্রিক টন সরিষা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি বছরে বরিশালে এ নিবিড় সরিষা উৎপাদন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়।

সূর্যমুখী : জেলার ১০টি উপজেলাতেই সূর্যমুখী চাষের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। বছর দুই আগে সদর উপজেলার অমৃত সাগরে "অমৃত লাল সূর্যমুখীর তেল কারখানা" স্থাপন করা হয়। জেলায় যে পরিমাণ সূর্যমুখীর চাষ হয় তা স্থানীয় সূর্যমুখীর তেল কারখানার চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত। চলতি বছরে কৃষি অধিদপ্তর ২,০০০ একর জমিতে ১,৫০০ টন সূর্যমূখীর বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। চাষীদের লাভ ও স্থানীয় কারখানার চাহিদা মেটাতে সূর্যমুখী চাষ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া আরো নিবিড় করা প্রয়োজন।

সূর্যমুখী চাষের জমি

উপজেলা	জমি (একর)
সদর উপজেলা	৪৩০
বাবুগঞ্জ	৪০০
উজিরপুর	১০০
গৌরনদী	৯০
আগৈলঝাড়া	১০৫
হিজলা	১০২
মূলাদী	২৬৭
বাকেরগঞ্জ	২৩৫
বানারী পাড়া	১৬২
মেহেন্দী গঞ্জ	২০৯
মোট	**২,১০০**

মৎস্য সম্পদ : জেলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মাছের প্রাচুর্য্য। বর্ষাকালে নদী, নালা, খাঁড়ি ও ধানক্ষেত থেকে প্রচুর

পরিমাণে নানা প্রজাতির মাছ ধরা হয়। কেননা, এখানে লোনা ও মিঠা পানির মাছ দুই-ই পাওয়া যায়। বরিশালের জনগণের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি হল মাছ ধরা। ২০০১-২০০২ সালে জেলায় মোট ৩৩,৮৯৭ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয় এবং তা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল (২,৫১,৯৯৯ মে. টন) এবং বাংলাদেশ (৬,৮৫,০৮০ মে. টন) এর পরিমাণের তুলনায় যথাক্রমে ১৩% এবং ৫%। উল্লেখ্য, নদী-মোহনায় ২৩,৬২৪ মে. টন বন্যাপ্লাবন এলাকায় ১০,২৫৬ মে. টন ও বিল এলাকায় ১৭ মে. টন মাছ ধরা হয়। এ ছাড়া জেলার নানা ধরনের পুকুর থেকে মোট ১৫,৭৬১ মে. টন মাছ চাষ করা হয় (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০০৩)।

জলাভূমি	মে. টন
নদী-মোহনা	২৩,৬২৪
বন্যাপ্লাবন ভূমি	১০,২৫৬
বিল	১৭
মোট	৩৩,৮৯৭

চিংড়ি : এলাকায় চিংড়ি চাষের বিস্তার শুরু হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব (২০০৩) অনুযায়ী গত ২০০০-২০০১ সালে জেলায় মোট ৬৪ হে. চিংড়ি (গলদা ও বাগদা) ঘের থেকে মোট ৯ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। উল্লেখ্য, বিগত ১৯৯৬-৯৭ সালে চিংড়ি চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৪ হে. এবং তা থেকে প্রায় ১০ মে. টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। এ হিসাব দেখায়, বরিশালে চিংড়ি চাষের জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ একেবারেই বাড়েনি। মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২), বিপদাপন্নতা স্টাডি (২০০৩) এবং পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বলা যায় যে, জেলার মাছ চাষীদের অজ্ঞতা, প্রশিক্ষণের অভাব, বিনিয়োগের অভাব, চিংড়ি পোনা পরিচর্যার অভাবের কারণে জেলার চিংড়ি উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

সাল	চিংড়ি ঘের (গলদা ও বাগদা)	উৎপাদন
১৯৯৬-৯৭	৬৪ হেঃ	১০ মে.টন
২০০০-২০০০১	৬৪ হেঃ	৯ মে.টন

শুঁটকি মাছ : আজ থেকে প্রায় ৩৩ বছর আগে আগৈলঝাড়া সদর থেকে ১০/১২ কি.মি. দূরে পয়সা নদীর তীরে পয়সারহাট বেড়ি বাঁধের পাশে "আগৈলঝাড়া শুঁটকি পল্লী" গড়ে ওঠে। সে সময়ে আগৈলঝাড়ার বাকল, বাগধা, রাজিহার, রামশীল, রাজাপুর, বাশাইলের বিল হাওড়ে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যেত। আর তাই, ঐ এলাকার কিছু জেলে পরিবার শুঁটকি তৈরির নিজস্ব প্রক্রিয়া চালু করে। তখন থেকে এ শুঁটকি পল্লী পরিচিত হতে থাকে এবং প্রতি বছর নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত নানা জাতের দেশীয় মাছের শুঁটকি তৈরি করা হয়। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পরে সিলেট, ঢাকা, ফেনী, চট্টগ্রাম এলাকায় এ শুঁটকি সরবরাহ করা হয়।

পশু সম্পদ : কৃষি শুমারী ১৯৯৬ অনুসারে বরিশাল জেলার গ্রামীণ এলাকায় মোট ১,৬৪,৩৪২টি গৃহের গবাদিপশু রয়েছে, যা মোট গ্রামীণ গৃহস্থালির ৪৫% এবং গৃহস্থালিগুলোর মোট গবাদিপশুর সংখ্যা মোট ৪,০৩,৬৬৫। অর্থাৎ, প্রতিটি ঘরে গড়ে ২.৫টি করে গবাদিপশু আছে। এ ছাড়া গ্রামীণ গৃহস্থের মোট হাঁস-মুরগির মোট সংখ্যা ৩০,১০,৪১৬ এবং ঘর প্রতি গড়ে ৮টি করে হাঁস-মুরগী রয়েছে। এ ছাড়া জেলায় মোট ১২৬টি পশু সম্পদ খামার এবং ৭৯১টি হাঁস-মুরগী খামার রয়েছে (বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)।

মোট গবাদিপশু র সংখ্যা	৪,০৩,৬৬৫টি ঘর
প্রতি গবাদিপশু (গড়)	২.৫ টি
মোট হাঁস-মুরগি র সংখ্যা	৩০,১০,৪১৬ টি
ঘর প্রতি হাঁস-মুরগি (গড়)	৮টি

দুর্যোগ

নদী ভাঙন, নদী ভরাট, আর্সেনিক দূষণ, জলাবদ্ধতা, পানি-মাটির লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা বরিশাল জেলার প্রধান কয়টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ ছাড়াও মানুষের কাজকর্ম, অসচেতনতা, দারিদ্র ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা/দুর্যোগ তো রয়েছেই।

নদী ভাঙ্গন : নদ-নদী খালের দেশ বরিশালে নদীর ভাঙ্গাগড়া চলছে অবিরামভাবে। এখানে নদ-নদীতে ২৪ ঘন্টায় দু'বার জোয়ার-ভাটা হয়। বর্ষাকালে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার জোয়ারে পানির উচ্চতা দশ থেকে বার ফুট পর্যন্ত বেড়ে যায়। বর্ষাকালে জোয়ার-ভাটার প্রভাব বেশি থাকে ও নিম্নাঞ্চল জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত জলমগ্ন থাকে। বর্ষা মৌসুমের শুরুতে নদীর ভাঙন ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। সন্ধ্যা নদীর অব্যাহত ভাঙনের মুখে স্বরূপকাঠি বরিশাল-ঢাকা সড়ক হুমকির মুখে। ইতিমধ্যেই রাস্তাটির বিরাট অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এবং বাকি অংশে মারাত্মক ফাটল দেখা দিচ্ছে। সন্ধ্যা নদীর কড়াল গ্রাসে বানারীপাড়া উপজেলার ব্রাহ্মণকাঠি, নাজিরপুর, ডাণ্ডোয়াট, উত্তরকূল এলাকার বিস্তৃর্ণ অঞ্চল নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। স্থানীয় লোক জন ইট ও ব্যাটস দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করে সড়ক পথে যানবাহন চলাচল চালু রেখেছে এবং এতে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটার ঝুঁকি রয়েছে।

বন্যা : বৃহত্তর বরিশাল জেলার একটি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল বন্যা। প্রবল বর্ষণ, অত্যধিক জোয়ার আর নিষ্কাষণ জটিলতার কারণে বন্যার প্রকোপ দেখা যায়। জেলার নদ-নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে তা দু'কূল ছাপিয়ে বন্যার রূপ নেয়। দেশের মধ্যভাগে বন্যা দেখা দিলেও বরিশালে বন্যা দেখা দেয়। এ বছর মধ্যাঞ্চলের বন্যার ঢল নেমে আসায় জেলার বন্যা পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মূলাদী, হিজলা আর মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা।

প্রতি বছর মধ্য বর্ষায় সৃষ্ট বন্যায় আউশ, আমন বীজতলা, শাক-সবজি ও পানের

উপজেলা/ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন	বন্যার উৎস	ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ
গৌরনদী : খাঞ্জাপুর, বার্থী, শরিকল, নলচিড়া ও চাঁদশী ইউনিয়ন	শরিয়তপুর, কালকিনী ও মাদারীপুরের বন্যার পানি	২১০০ একর ফসলী জমি হাজার পানের বরজ ও ১৭০টি নার্সারী সম্পূর্ণ বিনষ্ট।
আগৈল ঝাড়া : রাজিহার, বাকাল ও গৈলা ইউনিয়ন	কোটালীপাড়া ও মাদারীপুরের বন্যার পানি	রাজিহার ইউনিয়ন সম্পূর্ণ এবং বাকাল ও গৈলা ইউনিয়নের ৬০ ভাগ পানির নীচ; ১৬১৫ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট; ১৫২০ একরের ফসল আংশিক বিনষ্ট
হিজলা : হিজলা, মেমনিরা, জিলা, গৌরনদী, ধুমখোলা ও কুচাই পট্টি ইউনিয়ন	চাঁদপুর থেকে ধেয়ে আসা বন্যার পানি	৩ হাজার একর জমির আউশ ৫০০ একর জমির আমন বীজতলা ও হাজার হাজার পানের বরজ বিনষ্ট
মুলাদী : শফিপুর, বাটামার, নাজিরপুর, চরকালেকা, গাছুয়া ও মূলাদী ইউনিয়ন	শরীয়তপুর ও মাদারীপুরের বন্যার পানি	শফিপুর, বাটামারা ও নাজিরপুরের ৯০ ভাগ ফসলী জমি, চরকালেখা ইউনিয়নের ৬০% ও গাচুয়া মূলাদী ইউনিয়নের ৩০% ফসলি জমি পানির নীচে; ৫ হাজার একরের আমন ও আউশ বীজতলা বিনষ্ট;
বানারীপাড়া : বাইশরী, উদয়কাঠী, সেয়দকাঠী, ইলুহার ও বিশারকান্দি ইউনিয়ন	-	৩৫০ হেক্টর জমির আউশ, ৫০০ হেক্টরের সবজি, ৮০০ একরের বীজ তলা বিনষ্ট
উজিরপুর : শিকারপুর, উজিরপুর, সাতলা, হারতা, বকোঠা ইউনিয়ন	সন্ধ্যা নদীর পানি	গোটা উপজেলা প্লাবিত, মাছের ঘেরের ক্ষতি ও নদী ভাঙন বৃদ্ধি
বাকেরগঞ্জ : রঙ্গশ্রী, পাদ্রী শিবপুর, গাড়ুরিয়া, কলসকাঠী, কবাই	-	৫০০ হে: জমির রোপা আমন বীজ তলা ও আউশ ফসলের ক্ষতি
মেহেন্দীগঞ্জ : গাবিন্দপুর, জঙ্গালিয়া, ভাসানচর, গোপালপুর, আলমাবাদ, দরির চর, খাজুরিয়া, চর এককারিরা ইউনিয়ন	মেঘনা, তেঁতুলিয়া, গজারিয়ার নদীর পানি	২০০০০ হে: জমির ফসল বিনষ্ট; কয়েক শ একর ফসলী জমি নদীগর্ভে বিলীণ।
সদর : নিম্নাঞ্চল	-	ফসলী জমি ক্ষতিগ্রস্ত

বরজের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। এতে হাজার হাজার কৃষক সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। ঘেরের মাছ ভেসে যায়। নদী ভাঙন ভয়াবহ রূপ নেয়। বিগত ২০০৪ বন্যায় জেলার সব কয়টি উপজেলার ফসলী জমি পানির নীচে তলিয়ে যায়। বেশির ভাগ মাঠে গলা সমান পানি উঠেছিল। মেহেন্দীগঞ্জ, মেঘনা, তেঁতুলিয়া, গজারিয়া নদীর পানিতে গোবিন্দপুর, জাঙ্গালিয়া, ভাসান চর, চর গোপালপুর, আলিমাবাদ, দরিরচর কাজুরিয়া, চর এককরিয়া ইউনিয়নের কয়েকশত একর ফসলী জমি নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, সদর উপজেলার অর্থাৎ, বরিশাল নগরীর নিম্নাঞ্চলের ফসলী জমিতে বন্যার পানি ঢুকে পড়ে। আপদকালীন সমস্যা মোকাবিলা, বন্যার পূর্বাভাস, পূর্ব প্রস্তুতি, জনসচেতনতা জোরদার করার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। তা না হলে বন্যায় মানুষের সম্পদ ও জীবনের যে ক্ষতি তার রেশ বন্যাউত্তর কালে আরো ভয়াবহ রূপ নেবে।

নদী ভরাট : অপরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও নদী শাসন ব্যবস্থা এবং জটিল পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে জেলার নদ নদীগুলোতে পলির অবক্ষেপন বাড়ছে। আর তাই পলি পড়ে অকালে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে জেলার পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। নদীগুলো তাদের নাব্যতা হারিয়ে অনুকূল প্রাকৃতিক প্রতিবেশ ও ভারসাম্য নষ্ট করছে এবং শহর, গ্রাম, জনপদের মানুষকে বিপদাপন্ন করে তুলছে।

জলাবদ্ধতা : জেলার নগর ও গ্রামাঞ্চলের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হল জলাবদ্ধতা। জেলার পুরোভাগই আজ আঞ্চলিক ও স্থানীয় এই দুই ধরনের জলাবদ্ধতার শিকার। নদী-নালা, খাল-বিল পলিতে ভরাট হয়ে যাওয়া, নদীর ভাটিতে পানি প্রবাহ কমে যাওয়া, অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন, রেল-সড়ক-মহাসড়ক, পোল্ডার নির্মাণ, অপরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও অবকাঠামো সর্বোপরি দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা জলাবদ্ধতাকে তীব্র করে তুলছে। এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে অপরিকল্পিত মাছের ঘের, নদী-খালে আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ, কচুরিপানা, পুকুর-খাল মজে যাওয়া, নদী-শাখা নদীতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের অলিখিতভাবে ইজারা নিয়ে ভোগ দখল ইত্যাদির কারণে জলাবদ্ধতা দিন দিন প্রকট হয়ে স্থায়ী রূপ নিচ্ছে। উল্লেখ্য, নিষ্কাশন খালে অবৈধ ইজারা এবং কাঁচা পাকা ড্রেনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই বরিশাল জেলা জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

আর্সেনিক দূষণ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা ০.০১ মি. গ্রা.। কিন্তু, বাংলাদেশে এর পরিমাণ ০.০৫ মি. গ্রা/লি.। বরিশাল জেলায় পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (২০০১) -এর তথ্যানুসারে জেলায় গভীর নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা ৯২ মি.গ্রা./লি: এবং জেলার প্রায় ৩০% নলকূপে আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মি.গ্রা./লি. -এর বেশি।

উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম
আগৈলঝাড়া	গৈলা	দাসপাড়া, দক্ষিণ সিহিপাড়া, মুড়িহর, গৈলা, কালুপাড়া
বাবুগঞ্জ	চান্দপাশা	দরিয়াবাদ, বাঁশগড়ি, ভবানীপুর
গৌরনদী	মাহিলারা	পশ্চিম বাজহরু
সদর	চড়বাড়িয়া	মুকন্দপট্টি

সূত্র : ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার, ২০০১

ভূ-গর্ভস্থ পানির অত্যধিক আহরণে জেলায় আর্সেনিক দূষণ ক্রমশ বাড়ছে। তাই নিরাপদ পানির সংকট দিনদিন তীব্রতর হচ্ছে। উল্লেখ্য, জেলার ১০টি উপজেলাতেই মাত্রারিক্ত আর্সেনিক সনাক্ত করা হয়েছে (ম্যাস লাইন মিডিয়া

সেন্টার, ২০০১)। বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের সাপানিয়া গ্রামে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২০০-র বেশি। কেবলমাত্র, সিকদার বাড়ির একই পরিবারের ১১ জন আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছে। এ হিসাব থেকে আর্সেনিক দূষণের ভয়াবহতার চিত্রটি অনুমান করা যায়। আর্সেনিক সমস্যা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক নেটওয়ার্কিং সেমিনারে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী (ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার, ২০০১) বরিশালের ৪টি উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের মোট ১০টি গ্রামের ৯০% নলকূপ আর্সেনিক দূষণ কবলিত।

দাবদাহ : দাবদাহ বরিশালের অন্যতম প্রধান একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের কারণে প্রতি বছর এই দাবদাহের সৃষ্টি হয়। প্রতি বছর চৈত্র-বৈশাখ মাসে দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হবার কারণে ও তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় এ দাবদাহ শুরু হয়, যা থেকে খরার সৃষ্টি হয়। দাবদাহের সময়ে জেলার স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৫°-৩৭° সে: এর মধ্যে ওঠানামা করে। দাবদাহের ফলে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে না। জলাশয়গুলো শুকিয়ে নিরাপদ পানির কষ্ট বাড়িয়ে তোলে। হাঁসমুরগী র খামারে মড়ক শুরু হয়। সব ধরনের রবিশস্য ও বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি, দিনমজুরের সংকট ও মজুরি বৃদ্ধি পায়। ফলে জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় ।

ঘূর্ণিঝড় : প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস জেলায় আঘাত হানে। তবে পরোক্ষ উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম অনুভূত হয়। সাধারণত প্রতি বছর মার্চের শেষ থেকে জুন-জুলাই পর্যন্ত এ জেলায় ঘূর্ণিঝড়ের আশংকা থাকে। পাশের সারণীতে জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কয়েকটি সাইক্লোনের হিসাব দেখানো হলো।

বছর	মাস	ঘূর্ণিঝড়ের গতি (কি.মি./ঘন্টা)	জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা (ফুট)	আক্রান্ত এলাকা
১৯৬৫	মে	২২৫	১১	সমগ্র বরিশাল জেলা
১৯৮১	ডিসেম্বর	১২০	৮	সমগ্র বরিশাল জেলা
১৯৮৩	নভেম্বর	১৩৬	৫	সমগ্র বরিশাল
১৯৮৬	নভেম্বর	৯০-১১০	২-৩	জেলার কিছু অংশ
১৯৯১	জুন	৭৫-১১০	৬	জেলার কিছু অংশ
১৯৯৮	নভেম্বর	৯০	৪-৬	জেলার কিছু অংশ

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : মাটি ও পানির লবণাক্ততা বরিশাল জেলার একটি অন্যতম দুর্যোগ, যা স্বাভাবিক কৃষি ব্যবস্থাকে অনিশ্চিত করে তোলে। এতে একদিকে যেমন ফসলের ক্ষতি হয়, অন্যদিকে জমির সার্বিক উর্বরতা হ্রাস পায়। নদীর গতিপথ পরিবর্তন, নদীর মুখ ভরাট হওয়া, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প ইত্যাদি আঞ্চলিক কারণ ও অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ, ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের অভাব, আর্সেনিক দূষণ প্রভৃতি স্থানীয় কারণে জেলার নিরাপদ পানির সংকট ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করছে। আর তাই, এসব এলাকায় পুকুর অথবা বৃষ্টির পানিই প্রধান ভরসা। শুকনো মৌসুমে পানির অভাবে এখানকার মানুষ লবণাক্ত ও আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করে।

মাটির উর্বরতা হ্রাস : জেলার মাটির উর্বরতা ক্রমশ কমছে, যা ফসল উৎপাদন ব্যাহত করছে। কৃষি অধিদপ্তর এর সূত্রানুসারে, বরিশাল বিভাগের প্রায় ২১% জমি চাষ না করে ফেলে রাখা হচ্ছে কেবলমাত্র ফসলী জমিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যাবার কারণে। স্থানীয় কৃষকদের মতে, জেলায় কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত যে ১৫টি খাত রয়েছে যেমন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কৃষি তথ্য সেবা, বন বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বিভিন্ন এনজিও ইত্যাদি তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের কারণেও জেলার কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

কীট পতঙ্গের আক্রমণ : বরিশালের কৃষকদের জন্য কীট পতঙ্গের আক্রমণ একটি বড় সমস্যা। প্রতি বছর আমন ধান পাকার মৌসুমে কীট পতঙ্গের আক্রমণ বেড়ে যায়। কৃষকদের অভিযোগ রয়েছে যে, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এ

বিষয়ে একেবারেই উদাসিন। বিভিন্ন উপজেলায় আবাদী জমিতে কীট পতঙ্গের মারাত্মক আক্রমণ সত্ত্বেও তারা এলাকা পরিদর্শনে যাননি।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তন জেলার আরেকটি সমস্যা। দৈনিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি, আগাম বর্ষা বা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, ও প্লাবনসহ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি - এ সবই জলবায়ুর পরিবর্তনের ঈঙ্গিত বহন করে। দীর্ঘ দিন ধরে বৃষ্টি না হবার কারণে খরীফ মৌসুমে খরার সৃষ্টি হয়।

পরিবেশ দূষণ : জলাপূর্ণ জেলা বরিশাল। আবহাওয়া, নিম্নাঞ্চলের কারণে জেলার পরিবেশ আর্দ্র মনে হয়। এর সাথে মানুষের অসচেতনতা-অজ্ঞতা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অবকাঠামো জেলার সামগ্রিক পরিবেশ দূষণে প্রভাব ফেলছে। মাছের ঘেরে সার, রাসায়নিক পদার্থ ও অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ঘের এলাকার পার্শ্ববর্তী খাল -নালার পানিকে দূষিত করছে। অন্যদিকে নাগরিক জীবনের একটি সমস্যা হল দৈনন্দিন বর্জ্য বা ময়লা অপসারণ ও অপর্যাপ্ত নগরায়ণ। তাই এটি শহরের বন্যা, যানজট বা পরিবেশ দূষণই কেবল করে না, বরং, স্থানীয় সমাজের জন্য এটি বিরাট স্বাস্থ্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক, পরিচ্ছন্ন নাগরিক জীবনের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অতি জরুরী।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : জেলার জলাভূমি ও মোহনায় মাছের প্রাচুর্য্য অনেকাংশেই কমে গেছে। অত্যধিক ও অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরা, মেঘনায় জাটকা নিধন মাছের প্রজাতির হ্রাসের একটি প্রধান কারণ। এ ছাড়া অপরিকল্পিত নদী শাসনের ফলে নদী-নালা ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় মাছের বহু প্রজাতি বিলুপ্ত হবার পথে।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা বলতে মানুষের জীবনে বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং সেই নেতিবাচক ঘটনার সাথে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকে বুঝায়। বিপদাপন্নতার ধরণ, প্রকার ও ব্যপ্তিতে ভিন্নতা আছে। সব রকম বিপদাপন্নতা দ্বারা জেলার সব এলাকার পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষ সমানভাবে আক্রান্ত হয় না। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান জীবিকা দল ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকদের উপর পরিচালিত এক বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৪)-য় দেখা গেছে, বরিশাল জেলার ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবনে আর্থ-সামাজিক প্রাকৃতিক বিপদাপন্নতার প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর। মাছের রোগ, বাজার দর, সাইক্লোন/জলোচ্ছ্বাস, পলি অবক্ষেপণ, মাছের প্রজাতি হ্রাস, পুঁজির অভাব, অবৈধ উপায়ে মাছ ধরা, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ইত্যাদি জেলেদের জীবনের বিপদাপন্নতা। গ্রামীণ কৃষকদের জীবনে প্রাকৃতিক আর্থ-সামাজিক ও ভৌত বিপদাপন্নতার সমান প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে শহুরে শ্রমিকরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপদাপন্ন।

জীবিকা দল	বিপদাপন্নতা
ক্ষুদ্র কৃষক	কৃষি উপকরণের উচ্চ মূল্য, অভাব, বাজারদর, অপর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা, সাইক্লোন বা জলোচ্ছ্বাস, অতি বৃষ্টি, জোয়ারে বন্যা, জলবদ্ধতা, দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাব।
জেলে	মাছের রোগ, বাজার দর, সাইক্লোন/জলোচ্ছ্বাস, পলি অবক্ষেপণ, মাছের প্রজাতি হ্রাস, পুঁজির অভাব, অবৈধ উপায়ে মাছ ধরা, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ইত্যাদি।
গ্রামীণ মজুরি শ্রমিক	ঋতুভিত্তিক কাজ, কৃষি উপকরণের উচ্চ মূল্য, নিম্ন মজুরী, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, জোয়ারে বন্যা, জলাবদ্ধতা, পানি, পয়:সুবিধার অভাব, স্বাস্থ্য সেবার অভাব, জ্ঞান-শিক্ষার অভাব ইত্যাদি।
শহুরে শ্রমিক	কাজের অভাব, নিম্ন মজুরী, গৃহায়ণ সমস্যা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দক্ষতা শিক্ষার অভাব, পরিবেশ দূষণ, সাইক্লোন, জোয়ার, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি।

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

বরিশালের মোট জনসংখ্যা ২৩.৪৮ লাখ, যার মধ্যে ১১.৯৬ লাখ পুরুষ এবং ১১.৫২ লাখ নারী (বি.বি.এস., ২০০১)। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০ : ১০৩.৮। মোট জনসংখ্যার ৮৩% গ্রামে বাস করে। বরিশাল জেলা ঘনবসতিপূর্ণ জেলা। সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে এই জেলার অবস্থান ৮ম স্থানে। প্রতি বর্গ কি. মি. ৮৪৩ জন লোক বাস করে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৭৪৩ জন/ বর্গ কি. মি.।

শহুরে জনগণ (লাখ)	৩.৯৪
পুরুষ	২.১২
নারী	১.৮১
গ্রামীণ জনগণ (লাখ)	১৯.৫৪
পুরুষ	৯.৮৩
নারী	৯.৭০
পুরুষ-নারীর অনুপাত	১০৩.৮:১০০
নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত	০.৯৫
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি. মি.)	৮৪৩
ঘনত্বের ক্রম (৬৪টি জেলার মধ্যে)	
নবজাতক মৃত্যুর হার	৫৮
<৫ মৃত্যুর হার	৮৭

০-১৪ ও ৬০$^{+}$ বছর বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতার অনুপাত ০.৯৫, (বি.বি.এস., ২০০১)। এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৮ এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৮৭ (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

ঘর-গৃহস্থালি : বরিশাল জেলার শহরাঞ্চলে কম লোকের বসবাস লক্ষণীয়। শহুরে (.৭৯ লাখ) ও গ্রামীণ (৩.৯৬ লাখ) মিলিয়ে বরিশালের মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ৪.৭৫ লাখ। প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারে গড় জনসংখ্যা ৪.৯ জন, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় কম। জীবিকার ধরনের উপর গৃহস্থালির ধরন নির্ভরশীল। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী জেলায় মোট ৬.৬% গ্রামীণ নারী প্রধান গৃহস্থালি রয়েছে।

তবে সাধারণভাবে জেলার মানুষ অর্থনৈতিক দিক থেকে মোটামুটিভাবে স্বচ্ছল। ঘরের কাঠামো দেখেই একটি পরিবারের আর্থিক অবস্থা অনুমান করা যায়। ঘরের কাঠামোর বিবেচনায় ৪৯% ঘরে পাকা দেয়াল এবং ৬৪% ঘরে পাকা ছাদ আছে। ২০০১ সালের লোক গণনার প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ৩১% ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ রয়েছে।

মোট গৃহস্থালির সংখ্যা	৪.৭৫ লাখ
শহুরে	.৭৯ লাখ
গ্রামীণ	৩.৯৬ লাখ
গৃহ প্রতি গড় জনসংখ্যা	৪.৯ জন
নারী প্রধান গৃহ (মোট গৃহস্থালির)	৬.৬ %

জনস্বাস্থ্য : বরিশালের জণস্বাস্থ্য প্রাকৃতিক প্রতিবেশের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। আর তাই অত্যধিক গরমে বা তাপদাহে জেলায় প্রায়ই ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বিশুদ্ধ পানির অভাবে এ রোগ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য অবকাঠামোর অভাবে ও আর্থিক দৈন্যদশার কারণে আক্রান্ত রোগীরা আধুনিক চিকিৎসা সেবা পায় না। জেলার জনগণের মধ্যে প্রধানত যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা হল সর্দিজ্বর, ডায়রিয়া, আমাশয়, স্ক্যাবিস, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া ও পেপটিক আলসার ইত্যাদি।

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বরিশাল জেলায় ৩টি সরকারি হাসপাতাল, ৭টি বেসরকারি হাসপাতাল, ১০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৩২টি গ্রামীণ ডিসপেন্সারি রয়েছে (বি.বি.এস.,২০০১)। জেলা সদরের একমাত্র সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা মাত্র ১,০৯১। অর্থাৎ মোট ২,১৫২

জনের জন্য একটি হাসপাতাল (সরকারি) শয্যা রয়েছে।

বরিশালে জনস্বাস্থ্য সেবায় ভাসমান হাসপাতাল 'জীবনতরী' একটি নতুন সংযোজন। ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন এর উদ্যোক্তা। ইতিমধ্যে, বরিশালের দোয়ারিকার প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ জীবনতরীর চিকিৎসা সেবা পেয়েছে। উল্লেখ্য, জীবনতরী ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের একটি প্রকল্প যা "ওয়ার্ল্ড ইমপ্যাক্ট প্রোগ্রাম" - এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্যার জন উনলসন এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

বরিশালের স্বাস্থ্য সেবা খাত নানা সমস্য ও সংকটের সম্মূখীন। গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো ডাক্তার ছাড়াই চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিগত জুন মাসে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জেলার উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে ৫৮% অনুমোদিত পদ খালি রয়েছে। বেশিরভাগ উপকেন্দ্রগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় চিকিৎসকরা সেখানে বদলী নিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। বেশিরভাগ "পোস্টেড" চিকিৎসকরা তাদের "প্রাইভেট প্রাকটিস"-এর সুবিধার্থে শহরে অবস্থান করে উপকেন্দ্রে যাতায়াত অব্যাহত রাখেন।

উপজেলা	শূন্যপদ
বাকেরগঞ্জ	১১
বাবুগঞ্জ	১০
উজিরপুর	৭
গৌরনদী	৭
বানরীপাড়া	৬
আগৈলঝাড়া	৮
হিজলা	৪
মেহেন্দীগঞ্জ	৯
মোট	৬৮

বরিশাল জেলার মানুষ আর্সেনিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। অজ্ঞানতা, তথ্যের অভাব, কুসংস্কারের কারণে আর্সেনিকে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর গজব হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। সামাজিকভাবে তারা অদৃশ্য হয়ে পড়ছে। আক্রান্ত নারীদের বিয়ে দেয়া কষ্টকর হয়ে পড়ছে, শ্বশুরবাড়ি থেকে তারা বিতারিত হচ্ছে। এ রকম পরিস্থিতি সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অতি জরুরী।

>৫ বছরের কম শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	৮৭
১২-৫৯ মাস বয়সী শিশু অপুষ্টির হার	৮%
আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহাকারী গৃহ	৫২%

শিশু স্বাস্থ্য : বরিশাল জেলায় পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৮৭ জন এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৮% শিশুই অপুষ্টির শিকার (বা.প.ব্যু ইউনিসেফ, ২০০১)। এ পরিসংখ্যানে আরো দেখা গেছে যে, হাম, ডিপিটি ও পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৮১%, ৭২% ও ৯৩% শিশু। এ ছাড়া ৩২% শিশু ORT নিয়েছে। জেলার ৮৪% শিশু (৯-৫৯ মাস বয়সী)-কে ভিটামিন এ ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে। ৫২% গৃহ আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করে।

পানি ও পয়ঃসুবিধা : নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৯১% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে। বাকী ৯% অন্যান্য উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করে চাহিদা পূরণ করে। উল্লেখ্য, বরিশালে ৬৩% নলকূপেই আর্সেনিকের দূষণ পরীক্ষা করা হয়নি এবং মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪৫% মানুষ আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কথা শুনেছেন (বি.বি.এস.-

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাসহ গৃহ	৫৯%
অন্যান্য সুবিধাসহ গৃহ	৩৪%
পায়খানার সুবিধাবিহীন গৃহ	৭%
কল বা নলকূপের উপর নির্ভরশীল গৃহ	৯১%

ইউনিসেফ, ২০০১)। বরিশাল জেলার গ্রামীণ এলাকায় ৮৭ জন লোকের জন্য একটি করে সক্রিয় টিউবওয়েল রয়েছে এবং প্রতি বর্গ কি. মি.-এ সক্রিয় টিউবওয়েলের সংখ্যা মোট ১০টি (জ.প্র.অ, ২০০৩)। জেলার নলকূপগুলোর মধ্যে ৪% বিকল অবস্থায় পড়ে আছে। জেলায় মাত্র ৫৯% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে এবং ৩৪% ঘরে কাঁচা পায়খানা আছে। এ ছাড়া ৭% ঘরে কোনরকম কাঁচা বা পাকা পায়খানার সুবিধা নেই। শহর ও গ্রামাঞ্চলের পয়ঃসুবিধার চিত্র এক নয়।

শিক্ষা

বরিশাল জেলার জনসাধারণের সাক্ষরতার হার উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে ৪র্থ স্থানে। সাত বছর বয়সের উপরের মোট জনসংখ্যার সাক্ষরতার হার প্রায় ৫৭% (বি.বি.এস., ২০০১)। অন্যদিকে, প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বছর বয়সী ও তার উর্ধ্বের জনসাধারণের সাক্ষরতার হার ৬০%।

সাক্ষরতার হার (৭^{+})	৫৭%
প্রাপ্ত বয়স্কদের সাক্ষরতার হার (১৫^{+})	৬০%
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	৭৬
মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়	৩৩৩
কিন্ডার গার্টেন	১১২
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	৬৪
মাদ্রাসা	২২৭
মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৮১৭
সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	৯৫৪
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	৩,৪৪,৮৪৫
ভর্তির হার	৯৬
গড় বিদ্যালয় (প্রতি ১০ হাজারে)	৮

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০০৩) এর তথ্য অনুযায়ী বরিশাল জেলায় সর্বমোট ১,৮১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৯৫৪টি সরকারি। এ বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৩,৪৪,৮৪৫ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ৯৬%। প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার তুলনায় মোটামুটি পর্যাপ্ত। জেলায় প্রতি ১০০০০ জনগণের জন্য গড়ে ৮টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যা জাতীয় গড় সংখ্যা (৬)- এর তুলনায় বেশি (প্রা: শি: অ:, ২০০৩) । প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক সংখ্যা ৭,৪৫২ জন । অর্থাৎ, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৪৬:১। এ ছাড়া বি.বি.এস., ১৯৯৮ -এর তথ্য অনুযায়ী বরিশাল জেলায় মোট ১৩ টি কিন্ডার গার্টেন রয়েছে।

জেলায় মোট ৭৬টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে, যার ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যা যথাক্রমে ১৬,৫২১ ও ৮০১ অর্থ্যাৎ ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ২১:১। আবার জেলার মোট ৩৩৩টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১,৫৫,৭৩১ জন। মোট শিক্ষক সংখ্যা ৫,৮১৯ জন। অর্থ্যাৎ ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ২৭:১। অন্যদিকে জেলার মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ২২৭টি। মোট ৪২,৬০৬ জন ছাত্র ছাত্রীর জন্য ৪,১০২ জন শিক্ষক এখানে কর্মরত আছেন। ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১০:১, যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় ভাল। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট ৬৪টি মহাবিদ্যালয় আছে, যার মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৫৬,৫০৬ জন এবং ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ৩১:১। বরিশাল জেলার শিক্ষাখাতে বরিশাল মেডিকেল কলেজটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে আসছে।

উল্লেখ্য, বরিশাল জেলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত কয়টি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। বি .এম. কলেজ, অক্সফোর্ড মিশন হাইস্কুল, বানারীপাড়া ইউনিয়ন স্টেশন (১৮৮৯), পিংলাকাঠি সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৮২) ও ভেদুরিয়ারচর প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৯২) প্রভৃতি জেলার কয়টি পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

অভিবাসন

বরিশাল জেলার চরাঞ্চলে অন্যান্য এলাকা বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী জেলা যেমন শরিয়তপুর, মাদারীপুর, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, ঝালকাঠী, পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা থেকে দরিদ্র ও নদী ভাঙ্গা মানুষ এসে বসতি গড়ে তুলছে। জীবিকার তাড়নায় এদের কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। বি.বি.এস., ১৯৯১ - এর সূত্রানুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার (৯৮,৪৫১) প্রায় ৪.৪৬ % জনগণ বরিশালের বাইরে থেকে আগত। বরিশাল শহরে বিভিন্ন জেলা

থেকে আগত শত শত দরিদ্র পরিবার বস্তি এলাকায় বসতি গড়ে তোলে। এই সব বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার কোন নিরাপত্তা নেই। নেই কোন পুনর্বাসন কেন্দ্র। অশিক্ষা, দারিদ্রতা, পয়: সুবিধার অভাবেই এরা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরা পর্যাপ্ত ত্রান সাহায্য পায় না।

সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর বয়সী), নিরাপদ পানি সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয় একটি জেলার সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে পাওয়া সংখ্যা ও গণনার ভিত্তিতে বলা যায়, বরিশাল জেলা সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নে মোটামুটিভাবে এগিয়ে আছে।

সাক্ষরতার হার (৭+ বছর)	৫৭%
নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত	৯১%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	৫৯%
শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা	২,১৫২

প্রধান জীবিকা দল

মাটির উর্বরতা, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, জমির খণ্ডায়ন আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: নদী ভাঙন, জলাবদ্ধতা, জোয়ার মেঘনা মোহনার অফুরাণ মাছ, এ জেলার মানুষের জীবন ও জীবিকায় প্রভাব ফেলে। কৃষি উপকরণের উচ্চ মূল্য একটি পরিবারকে কৃষি কাজের উপর আর নির্ভরশীল করে রাখতে পারছে না। জেলেদের নিরাপত্তাহীনতা, নদী-নালা-মোহনা আর খালে মাছ কমে যাওয়া, মাছ ধরার উপকরণের উচ্চ মূল্য আর দাদন বা মহাজনী ব্যবসার কবলে পড়ে জেলেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা থেকে সরে আসছে। তাই আজ কৃষক থেকে কৃষি শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে মানুষ। উল্লেখ্য, জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হল ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ শ্রমিক (প্রধানত কৃষি শ্রমিক), শহুরে শ্রমিক ও জেলে।

জেলে : বরিশালের উপকূলীয় এলাকা ও চরাঞ্চলে বিশাল জেলে সম্প্রদায়ের বসবাস। মোহনা গভীর সমুদ্রে ট্রলার অথবা নৌকা নিয়ে এরা মাছ ধরে। এদের অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জেলে এবং প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আবার মুসলমানদের অনেকেই মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত। মোট জেলে পরিবারের সংখ্যা ১৯,০০০, যা কৃষিজীবী পরিবারের ৭%। ৪,০০০টি মাঝারি জেলে পরিবার এবং ১৫,০০০ ছোট জেলে পরিবার রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৬)। উল্লেখ্য, বরিশালে কোন বড় জেলে পরিবার নেই।

জলদস্যুদের আক্রমণ, মাছ ধরার ট্রলার ছিনতাই, জীবননাশ - এ সবই আজকালকার জেলেদের জীবনে প্রায়ই ঘটছে। এ ছাড়া দাদন বা মহাজনী শোষণ তো রয়েছেই। এ ছাড়া মেঘনা মোহনায় মাছ কমে যাওয়ায় পেশাদার জেলেদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

কৃষক : জেলার মোট ক্ষুদ্র কৃষক (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫ - ২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ২,৪৮,৩৩৭টি, মাঝারি কৃষক (২.৫০ - ৭.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ৩৭,২৩৮টি এবং বড় কৃষক (৭.৫০^{+} একর) পরিবারের সংখ্যা মোট ২,৯২০টি (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

কৃষি শ্রমিক : ১৮৭৬ সালে W.W. Hunter বলেন, "বাকেরগঞ্জে ভূমিহীন কৃষক আদৌ দেখা যায় না। কেননা, সকলেই তাদের নিজ নিজ জমি চাষ করে থাকে"। ফসল কাটার মৌসুমে যে দিন মজুররা কাজ করে, তারা আসে

পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে। আবার বর্গাভাগের জমির সংখ্যাও ছিল নগণ্য। পরিবারের বিভাজনে মাথা পিছু জমির পরিমাণও ক্রমাগত কমে গিয়ে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। জেলায় মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ১,২২,২০৭টি (বি.বি.এস., ১৯৯৬)। কৃষি শ্রমিকদের জীবনে "নিম্ন মজুরি" একটি বিরাট সমস্যা বলে বিবেচিত। বিগত ১৯৯১-৯২ সালে কৃষি শ্রমিকদের গড় মজুরি ছিল ৩১ টাকা, ১৯৯৭-৯৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৭ টাকা (বি.বি.এস., ২০০২)।

শহুরে শ্রমিক : জেলায় শহরে শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কৃষি জমির অভাব, কাজের অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের (সিইজিআইএস, ২০০৩) কারণে গ্রামের ভূমিহীন ও অন্যান্য পেশার মানুষ শহরে এসে ভিড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এদের কেউ কেউ যোগালী, নির্মাণ শ্রমিক, মুটে, মজুর, তাঁত শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ বরিশাল জেলায় সামগ্রিকভাবে দিনমজুরির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ বাড়ছে।

চিংড়ি চাষী : জেলায় কৃষকরা চিংড়ি চাষে উৎসাহী হয়ে উঠছে। তাই পেশান্তর ঘটছে। অর্থাৎ কৃষক হয়ে যাচ্ছে চিংড়ি চাষী চিংড়ি চাষীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আশপাশের চিংড়ি চাষীদের সফলতা দেখে বর্তমানে বহু কৃষকই তাদের চাষের জমিকে চিংড়ি ঘেরে রূপান্তরিত করছে। শুধু তাই নয়, জেলার দরিদ্র জনসাধারণ আজ চিংড়ি পোনা ধরায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। আর তাই জেলার আগুনমুখা, তেতুলিয়া, বলেশ্বর নদী ও নালার আশপাশে অসংখ্য নারী-পুরুষ চিংড়ি পোনা ধরার কাজে নিয়োজিত ।

অর্থনৈতিক অবস্থা

বরিশালের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। ১৯ শতকে বরিশালের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনায় W.W. Hunter উল্লেখ করেন, "বরিশাল জেলায় মাত্র দু'একজন ছাড়া মানুষের আর্থিক অবস্থা ভাল। জেলার বাড়ির কাজের লোকসহ সবাই এক একজন ক্ষুদে জমিদার। কেননা প্রত্যেকেই তাদের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য প্রচুর চাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করে"।

জেলার মোট কর্মক্ষম জনশক্তি, মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ - এ সবই সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের প্রধান নির্দেশক। ১৯৯৯-২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বরিশালে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ১,৪৫২ হাজার যার মধ্যে ৫৭% পুরুষ। উল্লেখ্য, বিগত ১৯৯৫/৯৬ সালে কর্মক্ষম জনশক্তি ছিল ১,৪১০ হাজার (যার মধ্যে ৬৩% পুরুষ) অর্থাৎ বরিশালে কর্মক্ষম পুরুষদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে (বি.বি.এস., ২০০১)। চলতি বাজার দর অনুযায়ী জেলার বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় ১৪,৩৭৭ টাকা। বরিশালে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৬ হেক্টর এবং প্রায় ৩৩% কৃষি শ্রমিক পরিবার (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

মাথাপিছু আয় (টাকা)	১৪,৩৭৭
বি.বি.এস ক্রম (মাথাপিছু আয় অনুসারে)	৪১
মোট শিল্পে আয়	১৮
স্থিরদরে বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি	৫.৪
বিদ্যুৎ সংযোজনসম্পন্ন খানা	৩১

দারিদ্র্য

দারিদ্র দশা বর্ণনায় মি: হেনরী বেভারীজ বলেন, "বাংলার অন্যান্য এলাকার তুলনায় বাকেরগঞ্জে দারিদ্র কম ছিল। কেননা উর্বর জমি, মাছ পূর্ণ জলাশয়, বাগান ভরা নারিকেল, সুপারি আর খেজুর গাছের প্রাচুর্য্যে জেলার কৃষকরা আয়েশে দিন যাপন করে"। বরিশাল জেলার মোট জনসংখ্যার ৪৪% দরিদ্র এবং ১৯% অতি দরিদ্র (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)। এ ছাড়া জেলার মোট ৪৯% লোক ভূমিহীন এবং ৬৮% ক্ষুদ্র কৃষক (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

দরিদ্র	৪৪
অতি দরিদ্র	১৯
ভূমিহীন	৪৯
ক্ষুদ্র কৃষক	৬৮

নারীদের অবস্থান

অতি সম্প্রতি, সি পি ডি - ইউ.এন.এফ.পি.এ. বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক তৈরি করেছে। এতে দেখা যায় বরিশাল জেলা "নিম্ন মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতার" এলাকা। এখানে নারীরা পর্দাপ্রথার মধ্যে বসবাস করে। তাই, বোরখা পরে বাইরে চলাচল করার প্রচলন রয়েছে। নগরায়ণ, শিক্ষা, অনুকূল পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন আর দারিদ্র্য -এ সবই পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

লিঙ্গ অনুপাত : বরিশালের মোট জনসংখ্যার ৪৯% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ১০৪। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ১১১। অর্থাৎ, জন্মের সময় থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণের বয়স দলে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সংখ্যা অনেক বেশি। আবার প্রজননক্ষম বয়স দলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ৯৩ (বি.বি.এস., ২০০১)। অর্থাৎ প্রজনন বয়স দলে নারীদের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি।

বৈবাহিক অবস্থান : জেলার ১০ বছর ও তার ঊর্ধ্বে মোট জনসংখ্যা হল ১৭.০৬ লাখ। এর মধ্যে ৩০% নারী বিবাহিত এবং ০.২১% নারী স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস., ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৮৭% (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)।

- **১৫-৪৯ বছরের** লিঙ্গ অনুপাত **৯৩,** যা জাতীয় অনুপাতের (১০০) তুলনায় কম।
- **৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ৮৭,** যা জাতীয় হারের (৯২) তুলনায় কম।
- **কৃষিজীবী নারী প্রধান গৃহের সংখ্যা ৭%,** যা জাতীয় সংখ্যার (৩.৪%) তুলনায় বেশি।
- **পুরুষ-নারীর অনুপাত (১০৪:১০০),** যা জাতীয় অনুপাতের তুলনায় কম (১০৭:১০০)।
- **সাক্ষরতার হার ৫৫,** যা জাতীয় হার (৪১) এর তুলনায় বেশি।
- **স্বামী পরিত্যক্তা নারীর সংখ্যা ০.২১%,** যা জাতীয় সংখ্যার (০.৩৭) তুলনায় কম।
- **মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯৮,** যা জাতীয় হারের (৯৮) সমান।
- **মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬ জন , যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) তুলনায় কম।**
- **জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩৯%, যা জাতীয় (৪৪%)** ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।

প্রজনন স্বাস্থ্য : জেলার নারীদের মোট প্রজনন হার ৩.০ (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ একজন নারী তার জীবদ্দশায় গড়ে ৩টি সন্তান জন্ম দেয়। পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬ জন, যা নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে। জেলার ১৩-৪৯ বয়স দলের মোট ৩৯% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১% (নিপোর্ট, ২০০৩)।

শ্রম বিভাজন : নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। নারীদের ঘরের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বেশি। তবে, দরিদ্র পরিবারের নারীরা ঘরের বাইরে প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়া, দিনমজুরি ও পরের গৃহে শ্রম দেয়। মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মক্ষম পুরুষ সদস্যের অভাব ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে দরিদ্র নারীরা ঘরের বাইরে

নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। তাই বেঁচে থাকার তাগিদে তারা শহরাঞ্চলে কাজ নিতে বাধ্য হয়। সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রপঞ্চের উপর নির্ভরশীল। তথাকথিত পর্দা প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এ জেলার নারীদের গতিশীলতার প্রধান বাধা। তবে, নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের উপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রমউন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা, এনজিওদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও প্রকল্প কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করছে।

শ্রমশক্তি : বরিশালের নারীদের মধ্যে কর্মক্ষম শ্রম শক্তির হার ক্রমশ কমছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে কর্মক্ষম শক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে জনগণের ৩৭% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে তা বেড়ে হয় ৪৩% (বি.বি.এস.-২০০১)। এর মধ্যে ৪৬% গ্রামীণ নারী ও শহুরে নারী ২৮%। অর্থাৎ, গ্রাম ও শহরে নারীরা কাজ করছে। মূলত প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্র্যের কারণেই হোক, গ্রামীণ নারীরা সেই চিরায়ত অধঃস্তনতা ও পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। আর তাই, গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের ৩% নারীদের পরের জমিতে কাজ করতে দেখা যায় (বি.বি.এস., ১৯৯৬)। জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ২২.৮% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৫.৯% (নিপোর্ট, ২০০৩)।

স্বাস্থ্য পুষ্টি : জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৮ জন। অতি অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কাঠামো ও সেবা ব্যবস্থা জেলার নারীর স্বাস্থ্য দশাকে আক্রান্ত করছে। জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ৯ ভাগ, যা জাতীয় হারের (৬%) তুলনায় বেশি।

পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯৬% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন এবং ৭৬% ক্ষেত্রে আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশীরা সন্তান জন্ম নেয়ার সময় সহায়তা করেন। মাত্র ১৯% নারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দাইদের সেবা পান। তবে, আধুনিক ডাক্তারদের সেবাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা মাত্র ৫% (বি.বি.এস. - ইউনিসেফ, ২০০১)। এ তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায় বরিশালে প্রজনন স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণে নারীরা অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। যদিও এখনো নারীরা সন্তান জন্মদানে ঐতিহ্যবাহী দাইদের উপর বেশি নির্ভরশীল।

শিক্ষা : বরিশালের নারীদের সাক্ষরতার হার মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক। ৭ বছর$^{+}$ বয়সী মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫৫%, যা প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সাক্ষরতার হার (৫৭%) -এর তুলনায় কম (বি.বি.এস., ২০০১)। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বরিশালের মেয়েরা এগিয়ে আছে। মোট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৫০% মেয়ে শিশু, যাদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ৯৮, একই চিত্র দেখা যায় স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৫০% ছাত্রী। মাদ্রাসায় মোট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৪৯% ছাত্রী (ব্যানবেইস, ২০০৩)। তবে কলেজগুলোতে ছাত্রীসংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় কম। মাত্র ৩৮% ছাত্রী জেলার কলেজগুলোতে লেখাপড়া করে।

নারী নির্যাতন : ঘরের ভেতরে-বাইরে নারীরা প্রতিনিয়তই নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার। ঘরে নারী নির্যাতন জেলার একটি অতি পরিচিত ঘটনা। এ ছাড়া যৌতুক, বাল্য বিয়ে, বহু বিয়ে, নির্যাতন, হত্যা, জোরপূর্বক বিয়ে, মজুরি শোষণ এবং নারী ও শিশু পাচার জেলার নারী নির্যাতনের অন্যতম কয়টি উদাহরণ। চরাঞ্চলে বহু বিয়ের কারণে সামাজিক পরিবেশ বিপন্ন হতে চলছে। স্থানীয় জনমত অনুসারে, বহু বিয়ের মাধ্যমে চরাঞ্চলে সুবিধাবাদী শ্রেণীর লোকেরা জমি ও নারীর ভোগ দখল অব্যাহত রেখে চলছে। প্রতারণা, লাঞ্ছনা আর নির্যাতন চরাঞ্চলের নিত্য দিনের ঘটনা।

অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট

বি.বি.এস., ২০০৩ -এর তথ্য অনুযায়ী বরিশাল জেলায় মোট ২,৬৭৩ কি.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের মোট ৫৫৩ কি.মি. রাস্তার মধ্যে ৪৫৩ কি.মি. ফিডার রোড-এ, ৪০ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৬০ কি.মি. জাতীয় মহাসড়ক। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) ১৭৮ কি.মি. ফিডার রোড-বি, ১,০৪৯ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা, ৮৯৩ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা ধরন-২ রয়েছে। জেলায় রাস্তার ঘনত্ব ০.৯৬ কি.মি./ বর্গ কি.মি., যা উপকূল অঞ্চল (০.৭৬) ও জাতীয় অবস্থার (০.৭২) তুলনায় ভাল ।

উল্লেখ্য, বরিশাল নগরীর কিছু কিছু রাস্তাঘাট যানবাহন চলাচলে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। বর্ষা মৌসুমে ও ভূ-গর্ভস্থ কেবল লাইন বসানোর জন্য খোড়াখুড়ির কারণে রাস্তাগুলো চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বরিশাল সদরের রাস্তাঘাটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "বান্দরোড", যা ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আওতাভুক্ত। ১৮১১ সালে মি. জন বাট্টি, তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট বান্দ রোডের সংস্কার করেন। উল্লেখ্য, তারও আগে মি: উইনটেল স্টীমার ঘাট থেকে সাগরদী ঘাট পর্যন্ত এ বান্দরোড নির্মাণ করেন। এ বান্দরোডসহ নগরীর রাস্তাঘাটের করুণ দশা। এর মধ্যে বরিশাল স্টেডিয়াম, ব্যাপটিস্ট মিশন, মেডিকেল কলেজ, ভিআইপি কলোনির রাস্তা, ড্রেন, ফুটপাত আর স্লাব উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সামান্য বৃষ্টিপাতে এ সব রাস্তায় হাঁটু পানি জমে যায়। এ ছাড়া হিজলা উপজেলার তিনটি ইউনিয়ন - হিজলা, গৌরবদী ও কুচাইপট্টি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল।

পাকা রাস্তা	২,৬৭৩ কি.মি.
সওজ রাস্তা	৫৫৩ বর্গ কি.মি.
এলজিইডি রাস্তা	২,১২০ বর্গ কি.মি.
রাস্তার ঘনত্ব	০.৯৬ কি.মি./ বর্গ

নৌ-পথ

বরিশাল জেলার নদী-নালার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু তাই নয়, যোগাযোগ ও প্রশাসনের প্রেক্ষিতে নদী সিস্টেম গুরুত্ব বহন করে আসছে। বরিশাল জেলায় ৪৩৩ নটিক্যাল মাইল নৌপথ আছে এবং এখানকার নৌ পরিবহনের সুপ্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। বানারীপাড়া মেহেন্দীগঞ্জ ও বরিশাল সদর নৌপথে সংযুক্ত নয়।

জেলার মানুষের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কেননা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে একদিকে যেমন, মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষিসহ অন্যান্য পণ্য সরবরাহ এবং বাজারজাত করতে না পারায় জেলার অর্থনীতি দুর্বল থেকে যাচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম।

উপজেলা ভিত্তিক নৌপথের বিবরণ

উপজেলা	নৌপথ (নটিক্যাল মাইল)
আগৈলঝাড়া	৩৫
বাবু গঞ্জ,	৫০
বাকেরগঞ্জ	১২৮
গৌরনদী	১৯
হিজলা,	১০৮
মূলাদী,	৬৫
উজিরপুর	২৮
মোট	৪৩৩

প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সুবিধা পাচ্ছে না। বিছিন্ন চরাঞ্চল ও মূল ভূ-খণ্ডের মানুষের মধ্যে ব্যবধান থেকে যাচ্ছে।

পোল্ডার

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার তাগিদে ষাটের দশকে বরিশাল জেলায় পোল্ডার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। জেলায় মোট ২টি পোল্ডার রয়েছে। বরিশাল জেলার উপকূলবর্তী বাঁধের যথাযথ সংরক্ষণ অবশ্য প্রয়োজন। এলাকাবাসীর অসচেতনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য সহযোগিতার অভাব, বনায়নের অভাব, দুর্বল বাঁধ, বাঁধের ফাটল নদী ভাঙ্গনের তীব্রতাকে বাড়িয়ে তুলছে। তাই, এসব এলাকায় লোনা জলের প্রবেশ, প্লাবন, ফসলহানি, জলাশয়ের মাছ ভেসে যাওয়া ইত্যাদির সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বা.পা.উ.বো.) স্বাধীনতা উত্তরকালে আগৈলঝাড়া ও উজিরপুর উপজেলার বিল এলাকাকে পয়সারহাট ও হারতা নদীর জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে দীর্ঘ "উজিরপুর আগৈলঝাড়া বাঁধ" বেড়িবাঁধ নির্মাণ করে। এ বাঁধ নির্মাণের ফলে বাঁধের ভেতরের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। কিন্তু, কেটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ বেড়িবাঁধের রক্ষণাবেক্ষণে বা.পা.উ.বো. সব সময়ই উদাসীন ছিল। আর তাই ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালের বন্যায় বিভিন্ন স্থানে বাঁধ কেটে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৫৭টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে (এল.জি.ই.ডি, ২০০৩)। জেলার মোট জনসংখ্যার ৫% জনগণ এই আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে পারে। এগুলো ঘূর্ণিঝড়ের সময় জান-মালের নিরাপত্তা দেয় আর অন্য সময়ে বিদ্যালয় ও খাদ্য গুদাম হিসেবে ব্যবহার হয়।

হাট-বাজার ও বন্দর

রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, মানুষের চাহিদা, ভোগ্য পণ্যের বিস্তারের কারণে জেলায় হাট বাজারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। জেলায় মোট ২৮২টি হাট-বাজার রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৮)। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আরতদারীহাট, চক বাজার, পাতারহাট, উলানিয়াহাট, লাখুটিয়া বাজার, টারকী বাজার, কসবা পশুরহাট, সাহেবেরহাট ইত্যাদি। এ ছাড়া জেলায় ৩২টি নানা ধরনের মেলা বসে। সূর্যমনির মেলা ও বারণী মেলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বরিশাল নগরীর পোর্ট রোড এলাকায় জেলার প্রধান ইলিশের মোকামটি অবস্থিত। মূলত ভোলার চর মোন্তাজ, চর কুকড়ি মুকড়ি, শাশিগঞ্জ এবং বঙ্গোপসাগর কোল ঘেঁষা কৃয়াকাটা আলীপুর মহীপুর, খালসোড়া, গদ্দামতি থেকে ইলিশ আসে বরিশালের আড়তে।

হাটবাজারের খতিয়ান

আগৈলঝাড়া	২৮
বাবুগঞ্জ,	২৩
বাকেরগঞ্জ	৬৮
বানারীপাড়া	১৮
গৌরনদী	১৮
হিজলা,	৩৫
সদর	৮
মেহেন্দীগঞ্জ	২৮
মূলাদী,	৩৪
উজিরপুর	২২
মোট	২৮২

বরিশালে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ কৃষি কাজ মাছ ধরা ও মাছ চাষে নিয়োজিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় নদী বন্দর গড়ে ওঠেনি। তাই নৌ ও খেয়া ঘাটগুলোতে কৃষক ও জেলেদের উৎপাদিত ও আহরিত কৃষি পণ্য সরবরাহ করতে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ঘাটের সংখ্যা বাড়ানো হলে জেলার উৎপাদিত বা আহরিত কৃষিপণ্য বাজারজাত করার সুবিধা বাড়বে এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘুচবে।

বরিশাল একটি বাণিজ্য কেন্দ্র না হলেও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর। একটি সময় পর্যন্ত কেবলমাত্র নৌকায় চড়ে বরিশালে পৌছানো যেত। তবে, ১৮৮৪ সালে বরিশাল ও খুলনার মধ্যে প্রথম স্টীমার সার্ভিস চালু হয়। বেঙ্গল সেন্ট্রাল ফ্লটিল্লা কোম্পানী এটি চালু করে। এর পরে ১৮৯৬ সালে জেলার স্টীমার সার্ভিসের দায়িত্ব বর্তায় যৌথভাবে "ইন্ডিয়ান জেনারেল" ও "রিভার্স সিস্টেম" এর উপর, যা বর্তমানে বিআইডব্লিউটিএ-র আওতাভুক্ত। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহরে যোগাযোগের প্রধান নৌ-বাহন হল স্টীমার ও লঞ্চ। নারায়নগঞ্জ, খুলনা, মাদারীপুর, পটুয়াখালী ও চট্টগ্রামের সাথে বরিশালের স্টীমার সার্ভিস রয়েছে। জেলায় ১টি লঞ্চ টার্মিনাল ও ৩১টি লঞ্চঘাট রয়েছে (বি.বি.এস., ২০০২)।

নৌ-রুটে রাত্রিকালীন নৌ পরিবহন চলাচলে নিশ্চয়তা দেয়ার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বয়া ও সিগন্যাল বাতির ব্যবস্থা রয়েছে। উল্লেখ্য, দূরপাল্লার চৌকিঘাটা-বরিশাল-মোংলা নৌ-রুটে মোট ৪টি বয়া ও ৪৭টি সিগন্যাল বাতির ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া, চাঁদপুর-বরিশাল রুটে মোট ২৩টি সিগন্যাল বাতি এবং বরিশাল-বরগুনা রুটে ২টি বাতির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেঘনার জাহাজমারা ও বুড়িগঙ্গার ফতুল্লায় মাত্র এক বছরের ব্যবধানে গৌরনদী নারায়ণগঞ্জের এমভি দিগন্ত ও আগৈলঝাড়ার পয়সার হাট ঢাকা রুটের এমভি মিতালী লঞ্চ ডুবির পর থেকে টরকী-গৌরনদী-ঢাকা রুটের লঞ্চে যাত্রী ভিড় কমে দূরপাল্লার বাসগুলোতে ভিড় বাড়ছে।

বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ

বরিশাল জেলায় বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পন্ন ঘরের সংখ্যা ১,৪৫,৫৮০, যা মোট ঘরের ৩১%। তবে শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শহরের মোট ৬৫% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অথচ গ্রামে এর পরিমাণ মাত্র ২৪%। এ হার জেলায় নগরায়ণের বিস্তারকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে জেলার মাত্র ১০% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল (বি.বি.এস., ১৯৯৪, ২০০১)। অর্থাৎ এক দশকের তুলনায় বরিশালের বৈদ্যুতিক কাঠামোর অবস্থা বর্তমানে ভাল।

% শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ	৪৯%
% গ্রামীণ বিদ্যুৎ সংযোগ	১৯%
পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ	১,৪৫৬ বর্গ কি.মি.

পল্লী বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বরিশাল-১ স্টেশন থেকে বাকেরগঞ্জ, বরিশাল সদর, হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ ও মূলাদী উপজেলায় এবং বরিশাল-২ স্টেশন থেকে আগৈলঝাড়া, বাবুগঞ্জ, বানারীপাড়া, গৌরনদী ও উজিরপুর উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় জেলার ১০টি উপজেলার মোট ২,৭৯১ বর্গ কি.মি. এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বর্তমানে জেলায় মোট টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা ৪৯৪টি (বি.বি.এস., ১৯৯৮)। নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে নগরীর ৩০ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ কলাডেম, পশ্চিম কলাডেম, পশ্চিম চহ্ঠা, গণপাড়া, গন্ধকপাড়া দীঘির পাড়সহ সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা দরকার।

শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো

বিভাগীয় শহর হওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এখানে ভারী ও অত্যাধুনিক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। জেলার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর এবং শত বছরের ইতিহাসে এ কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে তেমন কোন কাঠামোগত পরিবর্তন আসেনি। উপনিবেশবাদ ও প্রজা-স্বাধীনতার সময়ে কিছু ক্ষুদ্র কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়া বড় ধরনের শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রচলন

ছিল। কারণ শিল্প কারখানার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা এটিকে প্রধান পেশা হিসেবে খুব কমই গ্রহণ করত। ফলে জেলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলেও বৃহৎ কোন ব্যবসায়ী শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। আর তাই এখন পর্যন্ত জেলার রপ্তানি দ্রব্য বলতে কৃষিপণ্যকেই বোঝানো হয়।

জেলায় কয়েক ধরনের শিল্প কল কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে টেক্সটাইল মিল, তাঁত, ধান কল, ময়দা কল, কাঠের কল, বরফ কল, অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি, বিড়ি ফ্যাক্টরি, মোমবাতির ফ্যাক্টরি, প্রিন্টিং প্রেস, তেল কল, বেকারী, ছাপাখানা ও বাঁধাই কারখানা, ব্যাটারী ফ্যাক্টরি অন্যতম। সময়ের ধারায় বরিশালে স্টীলজাত দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত কারখানা গড়ে ওঠে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে বাঁশ, বেত, কাঠের কাজ, যন্ত্রাংশ ঝালাই কারখানা, রিক্সা, রেডিও টিভি মেরামত কারখানা, জাল তৈরি, কামার ইত্যাদির কথা বলা যায়। জেলা সদরের কাউনিয়া রোডে বিসিক শিল্প এস্টেট অবস্থিত। ১৯৬০-৬১ সালে এটি স্থাপিত হয়। এখানে কোল্ড স্টোরেজ, বেকারী ও বিস্কুট ফ্যাক্টরি রয়েছে। জেলার সর্বত্র হস্তচালিত তাঁতের বিস্তার লক্ষণীয়। জেলায় ৭১২টি মাছের খামার, ১২৬টি পশুসম্পদ খামার, ৭৯১টি হাঁস মুরগীর খামার ও ২০টি হ্যাচারী রয়েছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে শীতল পাটি ও মাদুর তৈরির ইতিহাস সুপ্রাচীন। বিল ও চর এলাকার 'নল' ও 'হোগলা' দিয়ে এ শীতল পাটি তৈরি করা হতো। বর্তমানেও এর প্রচলন রয়েছে। গৌরনদী উপজেলার 'কাপালি' সম্প্রদায়ের লোকেরা 'গুন্নী' তৈরি করত, যা আজ নেই বললেই চলে। এ ছাড়া উজিরপুর ও বানারীপাড়ায় ধুতি তৈরির ব্যাপক প্রচলন ছিল। মাধবপাশার মশারী অতীত ও বর্তমানের মধ্যবিত্ত সমাজে খুবই সমাদৃত।

নৌকা তৈরি জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। বরিশালের লোকেরা যুগ যুগ ধরে নৌকা তৈরির পেশায় নিয়োজিত। মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় খোশ নৌকা ও আগরপুরে পানশী নৌকা তৈরি হতো। প্রতি বছর বর্ষা শুরুর আগেই নৌকার কারিগররা নৌকা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সাধারণত সুন্দরী, তাল, কড়ই, রয়না, আম ও কাফুলা গাছের কাঠ দিয়ে তারা নৌকা তৈরি করে। বর্তমানে নৌকার বাজার দর অনেক বেড়ে গেছে। কাঠের ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিই এর মূল কারণ। উজিরপুর উপজেলায় বিপুল পরিমাণে তালের ডোঙ্গা তৈরি হয় এবং নৌকার আকার ও গুনাগুন অনুসারে এর দাম হয় ৫০০-৩,০০০ টাকা। বর্ষায় জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিতে ডুবে গেলে নৌকাই একমাত্র বাহন। এ ছাড়া বরিশালের মৃৎ শিল্পের অনেক সুনাম রয়েছে। কলসকাঠী, বাউফল, কালিজিরা, রানীর হাট, কাউখালী ও মহেশপুর অঞ্চলের পাল সম্প্রদায় মৃৎ শিল্পের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে।

সেচ ও গুদাম সুবিধা

মোট কৃষি জমির মধ্যে ৩০% জমিতে সেচ দেয়া হয়। ভূ-উপরিস্থিত পানির সাহায্যে সেচ দেয়া হয় ২৯.৬% জমিতে। জমি সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার খুবই কম (০.১%) ।জেলার কৃষকরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী - দুই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। এখানে আধুনিক সেচ প্রযুক্তি বলতে প্রধানত নলকূপ, গভীর ও অগভীর নলকূপ, এল.এল.পি পাম্প ইত্যাদিকে বুঝায়। জেলায় মোট সক্রিয় নলকূপের সংখ্যা ৮৫টি, এল.এল.পি ৯৩৩টি এবং অগভীর নলকূপ ১২৪টি ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তির আওতায় মোট ৪৬,০৪৭ হেঃ জমিতে সেচ দেয়া হয় (বি.বি.এস., ১৯৯৮)।

সেচ এলাকা (মোট)	**৪৬,০৪৭ হে.**
সেচ এলাকা (%)	**৩০%**
ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার	**০.১%**
উপরিভাগের পানি ব্যবহার	**২৯.৬%**

বরিশাল জেলায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য গুদামজাতকরণের পর্যাপ্ত সুবিধা আছে। বি.বি.এস., ১৯৯৮ এর তথ্য অনুসারে এ জেলায় ৪৯টি খাদ্য গুদাম রয়েছে, যাদের প্রতিটির খাদ্যদ্রব্য ধারণ করার ক্ষমতা হল ৫৩,১৯৫ মে. টন। এ ছাড়া এখানে বীজ সংরক্ষণের জন্য ৬০০মে. টন ধারণ ক্ষমতার ২টি গুদাম আছে। জেলায় ৩টি সার গুদাম রয়েছে। যাদের প্রতিটির সার ধারণ করার ক্ষমতা হল ৭,০০০ মে. টন। জেলায় মোট ২টি কোল্ড স্টোরেজ একক রয়েছে, যাদের প্রতিটির গুদামজাত ক্ষমতা ৩ মে.টন।

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

বরিশাল জেলায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে । এর মধ্যে ২৬৯টি ক্লাব, ২০টি নারী সংগঠন, ১২টি গণ গ্রন্থগার, ২টি সঙ্গীত বিদ্যালয়, ১৮টি থিয়েটার দল, ১৪টি সিনেমা হল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩,৯৪১টি মসজিদ, ৪৪টি খৃষ্টীয় উপসানালয়, ৮০৫টি মন্দির, ৫টি মাজার এর কথা উল্লেখযোগ্য।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান

National Agricultural Research System (NARS)-র আওতায় বরিশাল জেলায় কৃষি, মৎস্য, মৃত্তিকা গবেষণা কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। জেলার আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্রটি বরিশাল সদরে অবস্থিত।

উন্নয়ন প্রকল্প

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৪-২০০৫ অনুসারে বরিশালে মোট ১২টি সরকারি সংস্থার মোট ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। উল্লেখ্য, এখানে যে সব প্রকল্প কেবল ২০০৪ সালের জুন মাসের পরে চালু আছে ও থাকবে তাদের হিসেব তুলে ধরা হয়েছে। যে সমস্ত সরকারি সংস্থার মাধ্যমে এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা হল বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিবেশ বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, ভূমি বিভাগ, জন স্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি। এ প্রকল্পগুলো প্রধানত বাংলাদেশ সরকার, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (IDA), ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিটি (EEC), বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP), নেদারল্যান্ডস সরকার (GoN), যুক্তরাজ্য সরকার (DfID), ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDA), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (CIDA), ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP), গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি (GEF), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB), ইউনিসেফ (UNICEF) ও কুয়েত সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ।

সরকারি সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	১
পরিবেশ বিভাগ	১
মৎস্য বিভাগ	১
ভূমি বিভাগ	১
জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	২
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	১
সড়ক ও জনপথ বিভাগ	৩
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	২
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	২

বরিশাল জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও-র উন্নয়ন কর্মকাণ্ড রয়েছে। বড় এনজিওগুলোর মধ্যে ব্র্যাক, আশা, কেয়ার-বাংলাদেশ, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক -এর নাম উল্লেখ্যযোগ্য। এ ছাড়া স্থানীয় সক্রিয় এনজিও -র মধ্যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলছে। প্রধান চারটি বড় এনজিও - আশা, ব্র্যাক, প্রশিকা ও কারিতাস কক্সবাজারে কাজ করে। এদের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত জেলার মোট ২০ % গৃহস্থ। গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ ৬,৭১৯ টাকা মাত্র (পিডিও- আইসিজেডএম, ২০০৩)। এ ছাড়া জেলার দুঃস্থদের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কাজ করছে।

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী গৃহস্থ (জন)	৯৬,০০৭
% গৃহস্থ (মোট)	২০%
মোট ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	৬৪.৫১
গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ (টাকা)	৬,৭১৯

হোটেল বা অবকাশ যাপন কেন্দ্র

বরিশাল জেলা আভ্যন্তরীণ পর্যটন এলাকা হিসেবে সম্ভাবনাপূর্ণ। এখানে পর্যটকদের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও ব্যক্তিখাতের উদ্যোগে কোন হোটেল, মোটেল বা অবকাশ যাপন কেন্দ্র গড়ে উঠেনি।

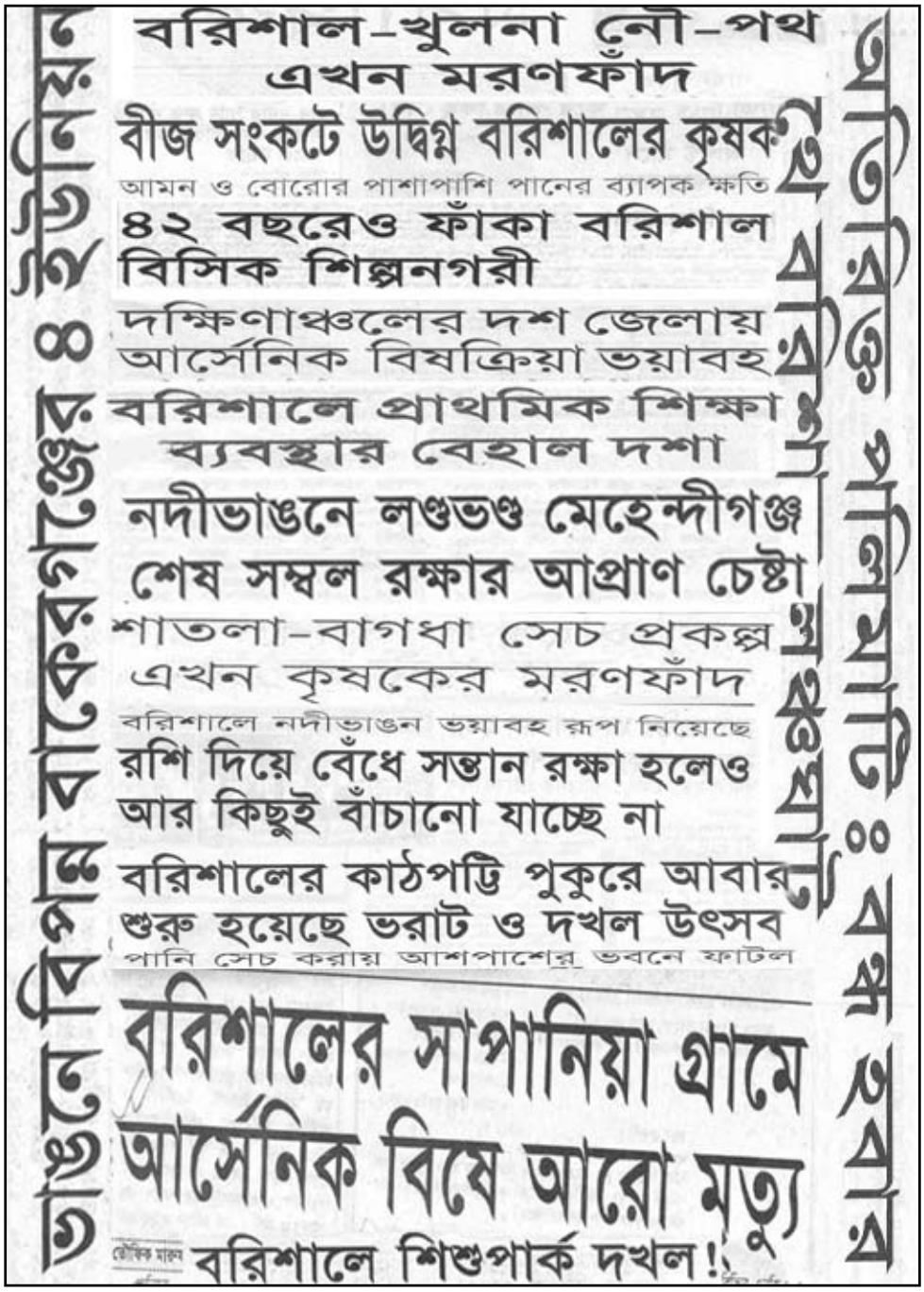

বরিশাল-খুলনা নৌ-পথ এখন মরণফাঁদ

বীজ সংকটে উদ্বিগ্ন বরিশালের কৃষক

আমন ও বোরোর পাশাপাশি পানের ব্যাপক ক্ষতি

৪২ বছরেও ফাঁকা বরিশাল বিসিক শিল্পনগরী

দক্ষিণাঞ্চলের দশ জেলায় আর্সেনিক বিষক্রিয়া ভয়াবহ

বরিশালে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা

নদীভাঙনে লণ্ডভণ্ড মেহেন্দীগঞ্জ শেষ সম্বল রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা

শাতলা-বাগধা সেচ প্রকল্প এখন কৃষকের মরণফাঁদ

বরিশালে নদীভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে

রশি দিয়ে বেঁধে সন্তান রক্ষা হলেও আর কিছুই বাঁচানো যাচ্ছে না

বরিশালের কাঠপট্টি পুকুরে আবার শুরু হয়েছে ভরাট ও দখল উৎসব

পানি সেচ করায় আশপাশের ভবনে ফাটল

বরিশালের সাপানিয়া গ্রামে আর্সেনিক বিষে আরো মৃত্যু

বরিশালে শিশুপার্ক দখল!

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

বরিশালের মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং নিজেদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। ২০০৩ সালে এ জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এ বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বণ্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩) থেকে জেলার মানুষের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে উঠে তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল :

কৃষি সমস্যা

বরিশালের কৃষকরা আজ নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। কৃষি জমির অভাব, জোতদারদের প্রতিপত্তি, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও উন্নত বীজ সারের অভাব, সেচের জন্য বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরতা জেলার প্রধান কৃষি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।

কৃষি উপকরণ ও সেচ সংকট : প্রতি বছর জানুয়ারি থেকে মধ্য মার্চ মাসে ইরি-বোরো বোনার মৌসুমে বীজ, সার ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষকরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। উপরন্তু বরিশালে খরার প্রভাব থাকায় সেচ সমস্যা প্রকট।

কীট পতঙ্গের আক্রমণ : ফসল পাকার মৌসুমে বা তার আগে কীটপতঙ্গের আক্রমণে জেলার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

মাটির উর্বরতা হ্রাস : সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারে বরিশাল জেলার মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষকরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ হচ্ছে।

জোতদারদের দৌরাত্ম্য : বরিশালের নয়টি উপজেলা অর্থাৎ, হিজলা, মূলাদী, মেহেন্দীগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, উজিরপুর, বাবুগঞ্জ, বানারীপাড়া, গৌরনদী ও আগৈলঝাড়ায় আমন ধান কাটার মৌসুমে উত্তেজনা বিরাজ করে। কেননা এ সব উপজেলার প্রভাবশালী জোতদার গোষ্ঠী যারা কিনা কোন না কোন ভাবে সরকারি খাস জমি দখলে ব্যর্থ হয়েছে, তারা সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়োগ করে এলাকার কৃষকদের ফসল লুটে ব্যবহার করে। এতে নিরীহ চাষী ও বর্গা চাষীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, টেলিযোগাযোগের অভাব স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই সন্ত্রাসীদের হাতে কৃষকরা জিম্মী হয়ে থাকে।

কৃষি সমস্যা
- কৃষি উপকরণ ও সেচ সংকট
- কীট পতঙ্গের আক্রমণ
- মাটির উর্বরতা হ্রাস
- জোতদারদের দৌরাত্ম্য
- জবরদখল প্রক্রিয়া
- বাঁধ কেটে দেয়া
- চিংড়ি চাষের প্রতিবন্ধকতা
- ভারতে ইলিশ রপ্তানির প্রতিবন্ধকতা
- কোল্ড স্টোরেজের অভাব
- মেঘনায় জাটকা নিধন
- মাছের সংকট
- খাল খনন

পরিবেশগত সমস্যা
- বন্যা
- ঘূর্ণিঝড়
- আর্সেনিক দূষণ
- দাবদাহ
- শৈত্য প্রবাহ
- নদী ভাঙন
- জলাবদ্ধতা
- জোয়ার
- মাটি-পানির লবণাক্ততা
- মাছের প্রজাতি হ্রাস
- জলবায়ুর পরিবর্তন

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়
- শিশু শ্রমের ক্রমবর্ধমান হার
- স্বাস্থ্য সেবা সংকট
- দাদন
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- তথ্যের অভাব
- নগর সমস্যা
- বেপরোয়া জমি দখল প্রক্রিয়া
- বস্তি সমস্যা
- বিপদাপন্নতার কারণ

যোগাযোগ সমস্যা
- অনুন্নত নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা

পর্যটন বিষয়ক সমস্যা
- উপযুক্ত অবকাঠামোর অভাব
- পর্যটন গাইড

জবরদখল প্রক্রিয়া : বরিশাল জেলার নালা-খালাগুলোতে অবাধে জবর দখলের প্রতিযোগিতা চলছে। গৌরনদী উপজেলার টরকী বন্দরের পূর্ব দিকের সাউদের খালটি জবর দখলের পায়তারা চলছে। পালরদী নদী ও টরকী খালের মোহনায় জেগে ওঠা চরটি দখল হয়েছে বহু আগেই। এখন গুরুত্বপূর্ণ এ খালটি দখলের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর যাবত সুন্দরদী ও টরকীর চর মৌজার প্রায় ৫০ একর সরকারি সম্পত্তি গ্রাস করে নিয়েছে একটি কুচক্রি প্রভাবশালী মহল। তারা সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করেই জবরদখল প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। তাই, ভূমি জরিপের কাজ থেকে শুরু করে ভূমি বন্দোবস্ত, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ জনগণের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।

বাঁধ কেটে দেয়া : বন্যার পানি সরিয়ে দেবার জন্য বাঁধের ভেতরের ও বাইরের বাসিন্দাদের স্থানীয় উদ্যোগে এক পক্ষ লাভবান হলেও আরেক পক্ষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন এ বছরের বন্যায় আগৈলঝাড়ার তালের বাজারে বাঁধ কেটে দেয়ার ফলে বাঁধের বাইরের বাসাইল, ভালুকাশি, গোয়াইলসহ ৮/১০টি গ্রাম মাত্র দুই ঘন্টার ব্যবধানে ডুবে যায়।

চিংড়ি চাষের প্রতিবন্ধকতা : চিংড়ি চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সরকারি পর্যায়ে কোন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। আর তাই, চিংড়ি চাষীদের পুঁজির অভাব, উন্নত পোনার সংকট, খাস জমি বন্টন সমস্যা, ব্যাংক ঋণের অভাব, নিরাপত্তাহীনতা আর কৌশলগত জ্ঞান বা প্রশিক্ষণের অভাবে জেলার চিংড়ি চাষ ব্যাহত হচ্ছে।

ইলিশ রপ্তানির প্রতিবন্ধকতা : বরিশাল জেলার ইলিশ ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে ভয়ানক বাধার সৃষ্টি হয়েছে। ২০০২ সালে হিমায়িত খাদ্যের উপর রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধি ও লভ্যাংশে বিশেষ শর্তমালা জুড়ে দেয়ার বিতর্কিত সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে ইলিশ রপ্তানিতে ভাটা পড়তে শুরু করে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেবলমাত্র বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারী এসোসিয়েশন (বিএসএফইএ)-র সদস্যরাই বিদেশে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিতে সক্ষম। কিন্তু বরিশালের ইলিশ রপ্তানিকারীদের কোন হিমাগার ও সদস্যপদ না থাকায় ভারতে ইলিশ রপ্তানি করা যাচ্ছে না। কেননা ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কাঠের বাক্সে হিমায়িত ইলিশ নেয়ার বিপক্ষে।

কোল্ড স্টোরেজের অভাব : মাছের হাটগুলোতে কোল্ড স্টোরেজের অভাবে জুন থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত ইলিশ মৌসুমে প্রচুর মাছ নষ্ট হয়। অতিবৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে মাছ দ্রুত চালান দিতে না পারলে মাছের দাম পড়ে যায় এবং জেলেরা মাছের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হয়।

মেঘনায় জাটকা নিধন : মেঘনায় জাটকা নিধনের ফলে মোহনায় ইলিশ অভয়ারণ্য বিলীন হতে চলেছে। সমূদ্র থেকে ইলিশ এ দেশের নদীতে না এসে প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারে চলে যাচ্ছে। এতে আভ্যন্তরীন উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ফলে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণে বরিশালের ইলিশ সম্ভাবনা ব্যর্থ হচ্ছে। নদীর নাব্যতা হ্রাস, পরিবেশ দূষণ প্রজনন ক্ষেত্র নষ্ট হয়ে যাবার কারণে জেলার ইলিশ সম্ভাবনা আজ হুমকির সম্মুখীন।

মাছের সংকট : বর্তমানে বিল হাওড় এলাকায় মাছ কমে যাওয়ায় শুঁটকি তৈরি ও ব্যবসা ব্যাহত হচ্ছে। মাছের প্রজনন ক্ষেত্রের অভাব, বিল হাওড়ে ইরি চাষ ও মাত্রাতিরিক্তি সারের ব্যবহার দেশী মাছ যেমন শোল, গজার, পুঁটি, টেংরার উৎপাদন আশংকাজনক হারে কমে গিয়েছে। আর তাই, ৭/৮ বছর আগে শুঁটকি বিক্রি করে যে সব পরিবার সচ্ছল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল, তারাই আজ অভাব অনটনসহ দারিদ্র্যের শিকার। বিল এলাকায় মাছের আকাল আজ জেলেদের জীবনের অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খাল খনন : জেলার কৃষি কাজে সেচের পানির অভাব বাড়ছে। জেলার উল্লেখযোগ্য খাল-নালার পুনর্খনন ও সংস্কার না করা এ সংকটকে বাড়িয়ে তুলছে।

পরিবেশগত সমস্যা

বন্যা : প্রবল বর্ষণ, নিষ্কাষণ জটিলতা আর দেশের মধ্যাঞ্চলে সৃষ্ট বন্যার চাপে জেলার নিম্নাঞ্চল সহজেই বন্যায় প্লবিত হয়। এতে জলাশয়ের মাছ, ফসল, গো-সম্পদ, হাঁস-মুরগী আর ঘর গেরস্থালীর সবজি বাগান ও গাছ পালার ব্যাপক ক্ষতি হয়। বন্যা উত্তরকালে পানিবাহিত রোগ ও চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

ঘূর্ণিঝড় : আপদকালীন নিরাপত্তার অভাব ও অপর্যাপ্ত বিপদ সংকেতের জন্য সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে জেলার মানুষের ও সম্পদের ক্ষতি হয়।

আর্সেনিক দূষণ : জেলার মানুষের জীবনে আর্সেনিক দূষণ একটি ভয়াবহ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অজ্ঞতা, তথ্যের অভাব আর কুসংস্কারের ফলে জেলার নিরীহ মানুষেরা আর্সেনিক দূষণের কারণে আজ নানা সামাজিক সমস্যার শিকার।

দাবদাহ : দাবদাহের কারণে জেলার জনস্বাস্থ্য ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রার স্বাভাবিক কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়ে। কৃষিখাতে দাবদাহের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের বিকল্প ধারার সেচ প্রক্রিয়ায় অনুপ্রাণীত করার চেষ্টা করছে, এর মধ্যে হস্ত ও পদ চালিত কৃষি সেচ পদ্ধতি অন্যতম।

শৈত্য প্রবাহ : প্রতি বছর শীতকালে একটানা প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহ ও ঘন কুয়াশায় ইরি ও বোরো বীজতলার ব্যাপক ক্ষতি হয়।

নদী ভাঙন : অব্যাহত নদী ভাঙনের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। নৌ চলাচল ভীষণভাবে ব্যাহত হয়।

নদী-নালা ও খাল ভরাট : জেলার নদী নালা খালগুলো ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই জেলার সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনা আজ ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন।

জলাবদ্ধতা : একটানা কিছুদিন বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা বন্যায় রূপ নেয়। অপরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কারের অভাব ও নদী শাসন ব্যবস্থা এবং জটিল পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে জেলার নদ নদীগুলোতে পলির অবক্ষেপণ বাড়ছে। আর তাই পলি পড়ে অকালে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে জেলার পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে, সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী লবণাক্ততা নদীগুলো তাদের নাব্যতা হারিয়ে অনুকূল প্রাকৃতিক প্রতিবেশ ও ভারসাম্য নষ্ট করছে এবং শহর, গ্রাম, জনপদের মানুষের জীবনকে বিপদাপন্ন করে তুলছে।

জোয়ার : ভরা জোয়ারের সময় চরের জনপদ তলিয়ে যায়। পানির মধ্যে জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে বসবাস করে। জোয়ারের আসা যাওয়ার উপর নৌপরিবহন ব্যবস্থা নির্ভরশীল। যার কারণে চরাঞ্চলের লোকজনদের যাতায়াতে অপরিসীম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

মাটি-পানির লবণাক্ততা : দুর্বল অবকাঠামো জেলার মাটি-পানির লবণাক্ততা বিশেষত চরাঞ্চলের মানুষের জীবনকে আক্রান্ত করছে বেশি। গ্রামে খাবার পানির সংকট দিনদিন তীব্রতর হচ্ছে। কৃষকরা সেচের পানি পাচ্ছে না। পুকুর জলাশয়ে মাছ চাষ ব্যাহত হচ্ছে।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : মেঘনা নদীতে অতিরিক্ত মাছ আহরণ, পরিবেশ দূষণ ও অন্যান্য কারণে মাছের প্রজাতি হ্রাস হচ্ছে। মেঘনা মোহনায় মাছের সংকট তীব্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে জেলার পেশাজীবী শ্রেণীর জীবন ও জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এতে ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেদের জীবনে "আয়ের নিরাপত্তাহীনতা" তীব্রতর হচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় : বরিশালের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে। এলাকার প্রভাবশালী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে অনেকেই পৈত্রিক ভিটেবাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। জোরপূর্বক টোল আদায় ও নির্যাতনের ঘটনা অহরহ ঘটছে। জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এটি একটি বিরাট হুমকি।

শিশু শ্রমের ক্রমবর্ধমান হার : সাম্প্রতিককালে বরিশাল জেলায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়তে শুরু করেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য (দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেট, ২০০৪) অনুয়ায়ী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ২৫,০০০ -এর চেয়ে বেশি। এদের প্রত্যেকে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত এবং এদের বয়স ১২ বছরের নীচে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে এসব শিশুরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে বাধ্য হচ্ছে। এদের অধিকাংশই বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরা, ইটের ভাটা, বিড়ি কারখানা, ওয়ার্কশপ, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করে।

স্বাস্থ্য সেবা সংকট : চরাঞ্চলে সরকারি বা বেসরকারি স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র নেই। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তারা পার্শ্ববর্তী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে সেবা নিতে পারে না। পানীয় জলের সংকটে তাদের দূর দূরান্ত থেকে পানি সংগ্রহ করে আনতে হয়। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার অভাবে পার্শ্ববর্তী খাল ও নালা ব্যবহারের ফলে তা ক্রমাগত দূষিত হয়ে পড়ছে।

দাদন : প্রতি বছর বরিশাল জেলার বিপুলসংখ্যক জেলে ইলিশ অভয়ারণ্যের কাছাকাছি আস্তানা গড়ে তোলে ও তারা দাদন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অগ্রীম হিসেবে ১০ হাজার টাকা ও জাল নেয়।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : বরিশাল জেলার চরবাসীরা আজ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। মেঘনাঞ্চল আজ অনেকাংশেই জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রনে। মাছ ধরা নৌকা বা ট্রলার ডাকাতি, গণলুট, জেলে অপহরণ, মুক্তিপণ, আক্রমণে বরিশালের জেলেরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এ ছাড়া এসব জেলেরা লক্ষীপুরের রামগতি আলেকজাণ্ডার ও ভোলার দৌলতখান, তজমুদ্দীন অঞ্চলে নৌ ডাকাতদের কবলে পড়ে। মেঘনা নদীর উপর জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রন না থাকায় বরিশালের জেলেদের জীবন আজ চরম সংকটের সম্মুখীন।

তথ্যের অভাব : বরিশালের দুর্গত বা প্রত্যন্ত চরের মানুষেরা আজ তথ্যশূন্যতায় ডুবে আছে। আজ যেখানে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে সমগ্র পৃথিবীকে "বিশ্বগ্রাম" বলে ধরে নেয়া হচ্ছে, সেখানে বরিশালের চর বাসীরা তথ্যের অভাবে অন্ধকারে ডুবে আছে, যা জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

নগর সমস্যা : বরিশাল নগরী আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। নগরীর বর্ধিত এলাকায় তুলনামূলকভাবে সমস্যা বেশি। উদাহরণ স্বরূপ, নগরীর প্রবেশ মুখের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কথা বলা যায়, সেখানকার বাসিন্দারা নগরীর সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এখানে সাপ্লাই পানির কোন ব্যবস্থা নেই। এমনকি কোন ডিপ টিউবওয়েলও নেই। তাই মহিলাদের হাঁটু পানি ভেঙ্গে বহু দূর থেকে পানি আনতে হয়। কিছু অংশে পল্লী বিদ্যুৎ থাকলেও অধিকাংশ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই।

বেপরোয়া জমি দখল প্রক্রিয়া : বরিশাল শহরে জেলা পরিষদের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। শহরের পোর্ট রোড, চাঁদমারী, মেডিকেলের সামনের এলাকা, সাগরদারী মোড় এবং চৌমাথা থেকে বটতলা পর্যন্ত রাস্তার পাশের জেলা পরিষদের জায়গা জোরপূর্বক দখল করা হচ্ছে।

বস্তি সমস্যা : বরিশাল শহরের যেখানে সেখানে বস্তি গড়ে উঠছে। ফলে, ছিমছাম, নয়নাভিরাম নারিকেল গাছের সারি আর নদী মেখলা সজ্জিত আর প্রাচ্যের ভেনিস হিসেবে খ্যাত বরিশাল শহরের পরিবেশ বিপন্ন হয়ে উঠছে। এ সব বস্তিতে প্রভাবশালী অপরাধী সন্ত্রাসী চক্র ভাড়াটিয়ার ছদ্মবেশে অবস্থান করে ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, নারী ব্যবসাসহ মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে, নগরীর আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।

বিপদাপন্নতা : বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৩)-তে জেলার প্রধান জীবিকা প্রধানত প্রাকৃতিক, ভৌত ও সামাজিক বিপদাপন্নতার শিকার। এর ফলে জেলে, ক্ষুদ্র কৃষক, চিংড়ি চাষী ও মজুরদের জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তাহীনতা প্রকট হয়ে উঠছে।

যোগাযোগ সমস্যা

অনুন্নত নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা : নদী বন্দর ও নৌঘাটগুলোর অবস্থা শোচনীয়। নিয়মিত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং মাস্তানদের দৌরাত্ম্যের কারণে জেলার নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে।

পর্যটন বিষয়ক সমস্যা

উপযুক্ত অবকাঠামো অভাব : জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহ্য নির্ভর স্থানগুলোতে পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্তরায় হল উপযুক্ত অবকাশ কেন্দ্র ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব । সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেলে পর্যটন শিল্প বিকশিত হবে।

পর্যটন গাইড : পর্যটন শিল্পের বিকাশে পর্যটন গাইডের ভূমিকা অপরিসীম। বরিশাল জেলায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সচেতন পর্যটন গাইড নেই।

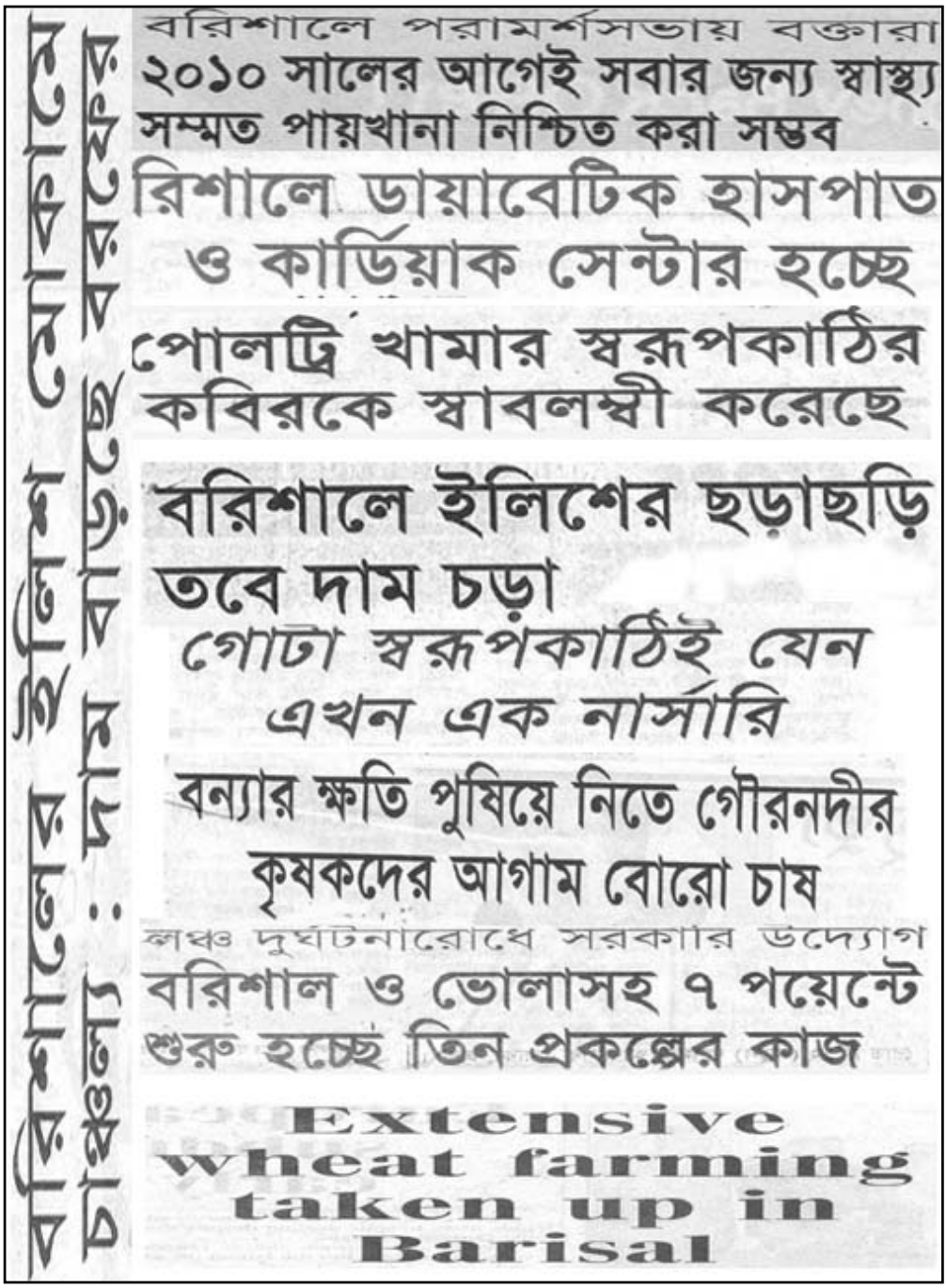

বরিশালের ইলিশ মোকামে চাঞ্চল্য : দাম বাড়ছে বরফের

বরিশালে পরামর্শসভায় বক্তারা
২০১০ সালের আগেই সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নিশ্চিত করা সম্ভব

রিশালে ডায়াবেটিক হাসপাত ও কার্ডিয়াক সেন্টার হচ্ছে

পোলট্রি খামার স্বরূপকাঠির কবিরকে স্বাবলম্বী করেছে

বরিশালে ইলিশের ছড়াছড়ি তবে দাম চড়া

গোটা স্বরূপকাঠিই যেন এখন এক নার্সারি

বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে গৌরনদীর কৃষকদের আগাম বোরো চাষ

লঞ্চ দুর্ঘটনারোধে সরকার উদ্যোগ

বরিশাল ও ভোলাসহ ৭ পয়েন্টে শুরু হচ্ছে তিন প্রকল্পের কাজ

Extensive wheat farming taken up in Barisal

সম্ভাবনা ও সুযোগ

জেলা ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের জনমানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের (২০০৩) মাধ্যমে জেলার প্রধান সম্ভাবনাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনউদ্যোগের কয়েকটি সম্ভাবনাময় দিক এখানে আলোচিত হল।

কৃষি ও অর্থনীতি

নিবিড় বোরো ও গম চাষ পদ্ধতি : ইতিমধ্যে জেলার কৃষকদের মধ্যে নিবিড় বোরো চাষ পদ্ধতিতে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ব্লক জমিতে বহু সংখ্যক প্রদর্শনী প্লট তৈরি করেছে এবং এখান থেকে উন্নত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা হবে। এ বীজ উপযুক্ত উপায়ে পরবর্তী মৌসুমের জন্য সংরক্ষণ করা হবে।

সবজি চাষ : বরিশালের মাটি, পানি ও জলবায়ু সবজি চাষের উপযুক্ত। জেলার ১০টি উপজেলাই সবজি চাষে এগিয়ে আছে।

সূর্যমুখী চাষ : বরিশালে সূর্যমূখীর বাণিজ্যিক চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। সূর্যমুখীর চাষে ততটা শ্রম বা অর্থ লগ্নি করতে হয় না। সামান্য যত্নে মাত্র ১০০-১২০ দিনের মধ্যেই বীজ উৎপাদন সম্পন্ন হয়। বাজারে সূর্যমুখীর বীজের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই অনেক কৃষক আজ এ লাভজনক ফসল উৎপাদনে এগিয়ে এসেছে।

সরিষা চাষ : বরিশালে সরিষা চাষের লাভজনক সম্ভাবনা রয়েছে। উপযুক্ত আবহাওয়া ও কীট পতঙ্গের আক্রমণ না থাকার কারণে জেলার কৃষকরা বাম্পার ফলন আশা করছে।

মাছের প্রজনন খামার : জেলার পরিত্যক্ত অব্যবহৃত জলাভূমি বা পুকুরে মাছের প্রজনন খামার গড়ে তোলা যায়। মাছের প্রজনন খামার প্রতিষ্ঠায় যথাযথ প্রশিক্ষণ ও নমুনা প্রদর্শন করে নারী-পুরুষের দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব।

সমন্বিত কীট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি/Integratd Pest Management(IPM) : জেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে IPM পদ্ধতি ব্যাপক সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে একজন কৃষক স্বল্প ও পরিমিত রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনে সক্ষম।

কৃষি ও অর্থনীতি
- নিবিড় বোরো ও গম চাষ পদ্ধতি
- সবজি চাষ
- সূর্যমুখীর চাষ
- সরিষা চাষ
- মাছের প্রজনণ খামার
- সমন্বিত কীট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
- ধানক্ষেতে মাছ চাষ
- চিংড়ি চাষ
- গো-খামার
- নার্সারী

প্রাকৃতিক সম্পদ
- জলাভূমি
- নদী ও মোহনার মাছ
- চরাঞ্চল

আর্থ-সামাজিক
- মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন
- গ্রাম কমিটি
- কমিউনিটি রেডিও
- বাঁধ সংরক্ষণ
- ভূমি ব্যবহার
- জীবনবীমা কার্যক্রম

শিল্প ও বাণিজ্য
- ব্যক্তিখাত
- শিল্পাঞ্চল
- শুঁটকি

পর্যটন শিল্প
- দর্শনীয় স্থান
- প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

যোগাযোগ
- অত্যাধুনিক টার্মিনাল কমপ্লেক্স
- নৌ/নদী বন্দর

ধানক্ষেতে মাছ চাষ পদ্ধতি : বরিশালে ধানক্ষেতে একই সাথে ধান ও মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, জেলার কৃষকদের এ সমন্বিত পদ্ধতিতে উৎসাহিত করতে হবে। এ পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে জৈব সার যেমন গোবর, ঘর গেরস্থালির বর্জ্য ইত্যাদির ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাবে।

চিংড়ি চাষ : জেলার চিংড়ি চাষের সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যথাযথ সাহায্য সহযোগিতা ও কৌশল অবলম্বন নিশ্চিত করা জরুরী। পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষের প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন থেকে শুরু করে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানি নিশ্চিত করা যাবে।

মৎস্য অভয়াশ্রম : আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় মুক্ত জলাশয়গুলোতে মাছের নিরাপদে বেড়ে ওঠা ও বংশ বিস্তারের স্থান নির্ধারণ করে মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে ও এটিকে জেলার মাছের সংকট মোকাবিলায় অন্যতম একটি উপায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

গো-খামার : চরাঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে গো-খামার বা গবাদিপশু প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাথান মালিকদের প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা বিশাল গবাদিপশুর পাল নিয়ে গো-খামার গড়ে তোলা যায়। এতে এটি একটি "কৃষি শিল্পে" পরিণত হবে।

নার্সারী : গোটা স্বরূপকাঠী উপজেলায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট বড় নার্সারী। এখান থেকে সারা দেশে বিভিন্ন ধরণের গাছের চারা সরবরাহ করা হয়। যা বরিশালের কৃষি অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা পূর্ণ।

প্রাকৃতিক সম্পদ

জলাভূমি : জলভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা একদিকে যেমন মৎস্য সম্পদ টেকসই করবে, অন্যদিকে পরিবেশ ভাল করবে।

চরাঞ্চল : জেলার দূরবর্তী নদী বিধৌত চরাঞ্চল এবং মূল ভূমির সাথে সংযুক্ত সব ক'টি চরে পরিকল্পিত উপায়ে মাছ চাষ, চিংড়ি চাষ, কৃষি, কিল্লা ও গো-চারণ ভূমি গঠনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

মোহনা-নদীর মাছ : জেলার মোহনা ও নদী-খালের মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। যথাযথ আইন প্রয়োগ, জেলেদের সুবিধা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও জলদস্যুদের প্রতিরোধের মাধ্যমে উপকূলে মাছের প্রজাতি রক্ষা ও বাণিজ্যিক আহরণ করা সম্ভব।

আর্থ-সামাজিক

মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন : এ সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করে তাদের জীবিকার নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ক্ষমতায়ন ঘটানো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করা এবং নদী মোহনায় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপায় নিশ্চিত করা যাবে।

গ্রাম কমিটি : জেলার জনগণকে সাথে নিয়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতনতা ও শিক্ষা প্রদান করতে হবে। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে গ্রাম কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে দলগত সিদ্ধান্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সহজ হবে। এতে করে দুর্যোগের আগে, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পরিকল্পিতভাবে দুর্যোগ মোকাবিলা করা ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যেমন এনজিও স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বয় সাধন সম্ভব হবে।

কমিউনিটি রেডিও : বরিশালের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গণমানুষের মাধ্যম হিসাবে কমিউনিটি রেডিও এক সম্ভাবনাময় গণমাধ্যমে পরিণত হতে পারে। কেননা এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণ তথ্য ও বিনোদনের সুযোগ নিজস্ব

ভাষায় সহজ করে তুলে ধরতে পারবে। নিজ এলাকার উন্নয়নে সমস্যা ও তার যৌক্তিক সমাধান, জনসচেতনতা সৃষ্টি, উদ্বুদ্ধকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংকেত, পূর্ব প্রস্তুতি, জানমালের নিরাপত্তা দিতে সাহায্য করবে। নিজ এলাকার আর্থ-সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ, দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরসন, মানবাধিকার, জবাবদিহিতা প্রভৃতি বিষয়ে স্থানীয় মতামত তুলে ধরতে স্থানীয় জনসাধারণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করবে।

বাঁধ সংরক্ষণ : বাঁধ সংরক্ষণে বাস্তব, সময়োচিত উদ্যোগ ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। ভাঙন রোধ, লোনাজলের প্রবেশে গতিরোধ, ফসল রক্ষা, শহর ও গ্রামাঞ্চল রক্ষায় সরকার ও স্থানীয় জনসাধারণের ঐকান্তিক সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন।

ভাসমান হাসপাতাল জীবনতরী : চিকিৎসার সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র আপামর জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত ভাসমান হাসপাতাল জীবনতরী, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বরিশালে এর ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

গৈলা বেবিহোম : ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলায় একটি বেবিহোম নির্মাণ করা হয়। অনাথ অসহায় শিশুদের জন্য নির্মিত এ হোমটি রাজস্ব খাতের অধীনে নিয়ে গেলে পরিকল্পনা মাফিক সুষ্ঠু কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

শিল্প ও বাণিজ্য

ব্যক্তিখাত : জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তিখাতের কার্যকলাপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিসহ পর্যটন শিল্পে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ জেলার অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করবে।

শিল্পাঞ্চল : প্রতিটি উপজেলায় শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে পারলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং অন্যদিকে উৎপাদন বাড়বে।

শুঁটকি : যথাযথ আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে এ জেলায় শুঁটকি শিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব এবং এ থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার সম্ভাবনাও প্রবল। চরাঞ্চলে স্বল্প দামের সোলার টানেল ড্রায়ার পদ্ধতিতে পুষ্টি ও গুণগত দিক থেকে উন্নতমানের শুঁটকি তৈরি করা সম্ভব। আগৈলঝাড়া শুঁটকি পল্লীর ঐতিহ্য পূনরুদ্ধারে প্রয়োজন জনসচেতনতা সৃষ্টি, উন্মুক্ত জলাশয়ের যথাযথ ব্যবহার, সোলার টানেল ড্রায়ার পদ্ধতির প্রচলন ইত্যাদি।

পর্যটন শিল্প

জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান রয়েছে। ঐতিহ্যনির্ভর এ স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে জেলায় পর্যটন আকর্ষণ গড়ে তোলা সম্ভব। জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে ঘিরে পর্যটন কর্মসূচী গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। কেননা জেলা সৃষ্টির শুরু থেকেই এটি নানা শাসক ও রাজ্যের অধীনে থাকার কারণে এর পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস অত্যন্ত বর্ণময়। আর তাই ঐতিহাসিক স্থান ও পুরাকীর্তিগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যও অপরিসীম।

যোগাযোগ

অত্যাধুনিক টার্মিনাল কমপ্লেক্স : বরিশালের পুরনো লঞ্চঘাটের সামনে নৌবন্দরের যে ৪ একর জমি ছিল, সেটিকে ঘিরে সম্প্রতি বিআইডব্লিউটিএ অত্যাধুনিক টার্মিনাল কমপ্লেক্স স্থাপনসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ভূমিহীন উদ্বাস্তু পরিবার, ইট ব্যবসায়ী, মসজিদ ও মার্কেট উচ্ছেদ করে সেখানে অচিরেই একটি অত্যাধুনিক টার্মিনাল

কমপ্লেক্স স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে বিআইডব্লিউটিএ। উদ্বাস্তু পরিবারগুলো কীর্তনখোলা চরের জমিতে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নৌ/নদী বন্দর : নদী বন্দর বা ঘাটের সংখ্যা বাড়ানো হলে জেলার উৎপাদিত বা আহরিত কৃষিপণ্য বাজারজাত করার সুবিধা বাড়বে এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘুচবে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

বর্তমান জনসংখ্যা ২৩ লাখ ৪৮ হাজার থেকে আগামী ২০১৫ সালে হবে ২৫ লাখ ৬৫ এবং ২০৫০ সালে ৩২ লাখ ৫১ হাজার। মাত্র ১৫ বছরে লোকসংখ্যা বাড়বে ২ লাখ ১৭ হাজার। ২০১৫ সালে, বাংলাদেশের দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর। জেলার জনসংখ্যার ৫১% পুরুষ এবং ৪৯ নারী আর ৮৩% গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ১৭ শহুরে জনগোষ্ঠী।

এ বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের জন্য যে সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায় তা হল, কৃষি, নদীর মাছ, মাছ চাষ, চিংড়ি উৎপাদন, পর্যটন, শিক্ষা ও গবেষণা সম্ভাবনা ইত্যাদি।

বরিশালের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিরাপদ পানি সুবিধা নিশ্চিত করতে স্বল্প মূল্যের আর্সেনিক প্রতিরোধ কৌশল, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বল্প সুদে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ও দুর্গত এলাকায় পাইপ লাইনে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, সরকারি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ সহায়ক হবে।

কৃষকদের কৃষি ঋণ, কৃষি উপকরণ, কৃষি প্রশিক্ষণ, সমন্বিত ধান মাছ চাষ পদ্ধতির প্রসার, নারী-পুরুষদের IPM পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ, কৃষিপণ্য বাজারজাত ও গুদামজাতকরণ নিশ্চিত করাসহ চরাঞ্চলে ও জেলার প্রত্যন্ত জনপদের জলাবদ্ধতা দূর করে এক ফসলী জমিগুলোকে দুই বা তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরের মাধ্যমে জেলার কৃষি নির্ভর অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

বরিশালের অনন্য সম্পদ মেঘনার ইলিশ। এ ইলিশের প্রাচুর্য ধরে রাখতে মেঘনায় জাটকা নিধন, কারেন্ট জালের যথেচ্ছ ব্যবহার ও নদী দূষণ প্রতিরোধ করতে পারলে জেলেদের জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়বে ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ইলিশের সরবরাহ নিশ্চিত হবে। জেলেদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে।

ক্ষুদ্র শিল্প কল কারখানার পাশাপাশি ভারী শিল্প কারখানা স্থাপন করা গেলে জেলার ঝিমিয়ে পড়া কৃষি শিল্প সম্ভাবনাকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া জেলার ১০টি উপজেলায় ১০টি শিল্পাঞ্চল করা যেতে পারে। শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় জেলায় প্রাপ্ত কাঁচামাল যেমন মাছ, কাঠ, অন্যান্য সামুদ্রিক কাঁচামাল, কৃষিপণ্য ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে, রাস্তা-ঘাট, বন্দর, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নিশ্চিত করে উপজেলার প্রবাসী ব্যক্তিবর্গকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা সম্ভব। উপজেলার প্রবাসী বাংলাদেশীরা একদিকে যেমন বিনিয়োগ করতে পারবে অন্যদিকে প্রবাসে থাকার কারণে রপ্তানিতে ভূমিকা রাখতে পারবে। বস্তুত, সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে এ উদ্যোগ বরিশালের অর্থনীতিতে বিরাট সাফল্য নিয়ে আসবে।

দর্শনীয় স্থান

বরিশালের ঐতিহাসিক ও পুরাকীর্তির নিদর্শনগুলো আজ মানুষের অসচেতনতা ও প্রাকৃতিক কারণে ব্যাপক হুমকির সম্মুখীন। যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এসব প্রাচীন শিল্প ও স্থাপত্যের পর্যটন মূল্য বাড়ানো সম্ভব। আর এর জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা।

ঐতিহ্যবাহী কাটপট্টি পুকুর : ব্রিটিশ উপনিবেশকালে, তৎকালীন জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বরিশাল নগরীর মধ্যবর্তী কাঠপট্টি ও সদর রোডের একাংশে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য একটি পুকুর খনন করা হয়। ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে পুকুরের চারদিকে চারটি ঘাট নির্মাণ করা হয়। পুকুরের পশ্চিমে আবাসিক এলাকা, পূর্বে কাঠপট্টি ও লাইন রোডের সংযোগ সড়ক ও উত্তরে কোতোয়ালি থানা অবকাঠামোগত সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে।

কালেক্টরেট ভবন : বরিশালের বর্তমান জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সীমানায় জরাজীর্ণ অবস্থায় ২০০ বছরের পুরনো কালেক্টরেট ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে। বরিশালবাসী এ ভবনটিতে জাদুঘর স্থাপনের দাবী জানিয়ে আসছে বহুদিন যাবত। আর তাই এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ভবনটি সংস্কারের কাজ শুরু করে। এ ভবনটি বরিশালের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

চাখার প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর : বানারিপাড়া উপজেলার চাখার ইউনিয়নে শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এর প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্দর জাদুঘর আছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের এবং শের-ই-বাংলার ব্যবহৃত কিছু জিনিষ পত্র এখানে সংরক্ষিত আছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এই জাদুঘরটির পরিচালনার দায়িত্বে আছেন।

প্লানেট ওয়ার্ল্ড : বরিশাল নগরীর কীর্তনখোলা নদীসংলগ্ন বান্দরোড লেডিস পার্কে একমাত্র শিশু বিনোদন কেন্দ্র প্লানেট ওয়ার্ল্ড অবস্থিত। গত ২০০১ সলের ৫ জানুয়ারি বেসরকারি উদ্যোগে সিটি করপোরেশনের সম্পত্তি লীজ নিয়ে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে এ পার্কটি নির্মাণ করা হয়। পার্কে রয়েছে আধুনিক ও আকর্ষণীয় কয়েকটি রাইড, একটি মিনি চিড়িয়াখানা, কৃত্রিম ব্রীজ, টিলা, ৮টি ফাস্ট ফুডের দোকানসহ একটি চাইনিজ রেস্তোরাঁ ইত্যাদি। এ পার্কটি নগরীর অন্যতম বিনোদন স্থানে পরিণত হয়েছে।

কসবা : গৌরনদী উপজেলার একটি প্রাচীন জনপদ কসবা, সেখানে মোগল আমলের মসজিদ ও দীঘি রয়েছে। কসবার মসজিদটি স্থানীয়ভাবে আল্লাহর ঘর নামে পরিচিত। এটি বরিশালের বৃহত্তম মসজিদ, যা নয় গম্বুজবিশিষ্ট এবং এর চারদিকে গোলাকার মিনার রয়েছে যার দেয়াল প্রায় ৬ ফুট পুরু। মসজিদের ভিতরের ৪টি স্তম্ভের মধ্যে দুটো মানুষের স্পর্শে সরু হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। মসজিদের উত্তরে হযরত দূত মল্লিকের মাজার (নির্মাণকাল: বাংলা ৮৯০ সন, ১লা জৈষ্ঠ্য) রয়েছে। এটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অন্যতম একটি তীর্থস্থান।

মাহিলারা : গৌরনদী উপজেলার প্রাচীন সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস সমৃদ্ধ একটি জনপদ মাহিলারা।

পাল আমলে বা তার আগে এ জনপদে বৈদ্য বিহার ছিল বলে অনুমান করা হয়। সাংস্কৃতি চর্চার বিদ্যাপীঠ হিসেবেও এর সুখ্যাতি ছিল। বৃটিশ উপনিবেশকালে মাহিলারা'র বহু লোক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। গ্রামের দক্ষিণে ১৫০ ফুট উঁচু সরকার বাড়ির মাটি প্রাচীন সংস্কৃতি, কলা ও স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। যথাযথ সাহায্য সহযোগিতা ও ব্যস্থাপনার মাধ্যমে এ ঐতিহ্য ধরে রাখা প্রয়োজন। এটি জেলার পর্যটন আকর্ষণ বাড়াতে সফল।

গৈলা : বরিশাল শহরের উত্তর-পশ্চিমে গৌরনদী উপজেলায় গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রাম অবস্থিত, যা সুলতানী আমলে বাংলা ও সংস্কৃত চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। জৈলার পণ্ডিত ত্রিলোচন কবি ভরণ সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রণী এ গ্রামটি বহু নামজাদা ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয়। গৈলা এ স্কুলে বহু নামী দামী ব্যক্তিত্ব পড়াশোনা করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হল অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন অমিয় দাস গুপ্ত। ১৮৯৩ সালে কতিপয় শিক্ষানুরাগীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা এ স্কুলটির ঐতিহ্য ধরে রাখতে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন রয়েছে।

রামসিদ্ধি : গৌরনদী উপজেলার একটি ঐতিহাসিক স্থান রামসিদ্ধি, এখানে একটি অতি প্রাচীন চার গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে এ ঐতিহ্যবাহী মসজিদটি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। কেননা রামসিদ্ধি এমন একটি পুরাতন ঐতিহ্যবাহী স্থান, যার উল্লেখ মেলে ১২২৫ সালে বিশ্বরূপ সেনের লিখিত ও খচিত তাম্র লিপিতে।

উজিরপুর : রাজা রামচন্দ্রের দেহরক্ষী রামমোহন মালের বংশধরদের স্মৃতি বিজড়িত এ উজিরপুর গ্রাম। কেননা এখানকার রাম পরিবার জমিদারীতে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাদের খনন করা দীঘি, মন্দির ও ভবন এখনও জমিদারীর স্মৃতি বহন করে চলেছে।

কাশীপুর : বরিশাল শহরের কাছাকাছি এ গ্রামটিতে চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের প্রতিষ্ঠিত অনেক পবিরার বসতি গড়ে তোলে। গ্রামটি শিব মন্দির ও মহামায়ার মন্দিরের জন্য বিখ্যত। নবাব মুর্শীদ কুলী খাঁ-র আমলে চন্দ্রদ্বীপের রাজা উদয় নারায়ণ স্বপ্নদিষ্ট হয়ে তার সৈন্য বাহিনীর জন্য দীঘি খননকালে মূর্তিটি পান এবং তিনি দীঘির পাড়ে মন্দির তৈরি করে তা স্থাপন করেন। প্রতি বছর মন্দিরের মেলা বসে।

লতা : মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার প্রাচীন জনপদ লতা, যার উল্লেখ রয়েছে তেরো শতকে কেশব সেনের তাম্র শাসনে। গ্রামটিতে বসবাসকারী নাগ ও দত্ত বংশ মূলত কুলীন কায়স্থ এবং এদের খারিজা তালুক ও জমিদারী ছিল। স্বদেশী ও স্বাধীনতা আন্দোলনে লতা গ্রামের অবদান অনস্বীকার্য। এক সময় লতা গ্রাম গাঞ্জী আশ্রয়ের জন্যও বিখ্যাত ছিল। এখানে শত শত হিন্দু মুসলমান একত্রে চরকায় সুতা কাটত। তবে, ১৯৫০ সালে বরিশালে দাঙ্গার ফলে লতার বর্ধিষ্ণু হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে চলে যায়।

লাখুটিয়া : বরিশাল কোতোয়ালী থানায় অবস্থিত লাখুটিয়া গ্রামটি একসময় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং লাখ লাখ টিয়া বাস করত। আর সে থেকেই নাম হয়ে যায় লাখুটিয়া। ১৬০২ সালে চন্দ্র দ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের স্ত্রী রানী বিমলা শামী দীঘি খনন করান। এখানে একসময় মাসব্যাপী রাস পূর্ণিমা মেলা বসত। প্রতি বছর শীতের শুরুতে অর্থাৎ নভেম্বর মাসে লাখুটিয়ায় সাত দিনব্যাপী রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে হাজার হাজার লোক অংশ নেয়।

দুর্গা সাগর : দুর্গা সাগর আজ একটি বনভোজন স্থানে পরিণত হয়েছে, যাতে এখানে অতিথি পাখীদের মেলা বসে। দূর্গাসাগর বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ দীঘি, যার আয়তন ২,৫০০ হেক্টর। বরিশাল শহর থেকে ১১ কি.মি. দূরে বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা গ্রামে এটি অবস্থিত। ১৭৮০ সালে রাজা জয়

নারায়নের মাতা রানী দূর্গাবতী এ দীঘি খনন করান। দীঘির মধ্যখানে জঙ্গলাকীর্ণ টিবি রয়েছে, যা দেখতে ছোট দ্বীপের মতো।

মাধব পাশা : বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশার অপর নাম ছিল শ্রী নগর, চন্দ্র দ্বীপের রাজ বংশের রাজধানী ছিল এই মাধব পাশায়। রাজ বাড়িটি আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ভেগাই হালদার মন্দির : আগৈলঝাড়া উপজেলার আগৈলঝাড়া কলেজের কাছের ভেগাই হালদার মন্দিরটি কষ্টিপাথরের বিষ্ণু মূর্তির জন্য বিখ্যাত। ১৯৭৯ সালে আগৈলঝাড়ায় একটি পুরনো দীঘি খননকালে চার ফুট লম্বা কৃষ্ণ পাথরের বিষ্ণু মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়, যা সমগ্র উপমহাদেশের একটি বিরল মূর্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রাজা গোবিন্দ্র চন্দ্রের আমলের এ মূর্তি দর্শনে প্রতি বছর দর্শনার্থীরা এখানে ভিড় করে।

শিয়ালাগুনি : বাকেরগঞ্জ উপজেলার শিয়ালগুনি গ্রামে সুলতানী আমলে নির্মিত একটি ঐতিহাসিক মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি যথাযথ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

লামচড়ি গ্রাম : সায়েস্তাবাদ ইউনিয়নে লামচড়ি গ্রামটি বিশেষ পর্যটন মূল্য রয়েছে। কেননা এখানকার বিখ্যাত লেখক আরজ আলী মাতুব্বর একজন দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও মননশীল লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ধর্ম ও লৌকিক ধর্মের মধ্যেকার পার্থকে লেখার মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলতেন। গোড়ামী, কুসংস্কারের বিরোধী এই মননশীল লেখক যুক্তিবাদের ভিত্তিতে এলাকাবাসীর চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেন।

এ ছাড়া রামমোহন সমাধি মন্দির, সুজাবাদ কেল্লা, সংগ্রাম কেল্লা, সরকল দূর্গা, গির্জা মহল্লা, বেলপার্ক, এবাদুল্লাহ্ মসজিদ, কাসাই মসজিদ, অক্সফোর্ড গির্জা, শংকর মঠ, মুকুন্দ দাসের কালিবাড়ি, ভাটিখানার জোড়া মসজিদ জেলার অন্যতম কয়টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। জেলায় মহান মুক্তিযুদ্ধের কয়টি প্রধান নিদর্শন বলতে ৩টি গণহত্যার স্থান, ২টি গণ কবর, ২টি ভাস্কর্য্য ও ৪টি স্মৃতি স্তম্ভের কথা বলা যায়।